অবাঞ্ছিত শিশু

অসীম বর্দ্ধন

অবাঞ্ছিত শিশু

অসীম বর্দ্ধন

এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্স ঃ কলিকাতা ১৯

প্রকাশনা ঃ
শুক্লা রায়চৌধুরী
এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্স
১৬এ ফার্ন রোড
কলিকাতা ১৯

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
৫।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৬০

দাম ঃ চার টাকা
মুদ্রণ ঃ
ভোলানাথ দাস
ওরিয়ন প্রেস
২১বি ক্রীক রো
কলিকাতা ১৪

প্রকাশকের কথা

এই বইখানির প্রকাশন সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলার আছে। বিংশ শতাব্দীর এই কয়েক বৎসরে মানবচিন্তার কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে এমন আকস্মিক ও অচিন্তনীয় অগ্রগতি দেখা দিয়েছে যে পূর্ব্বের বহুশতাব্দীর পুঞ্জীভূত চিন্তাসমৃদ্ধি তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। এ ধরনের ক্ষেত্র হল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, যন্ত্রশিল্প, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। এ ধরনের আর একটি ক্ষেত্র হল মনোবিজ্ঞান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান ছিল দর্শনলালিত অপাংক্তেয় শাস্ত্র, বিংশশতাব্দীতে সেই মনোবিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল স্বনির্ভর সুপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন জ্ঞানের উৎস। বস্তুতঃ বিংশশতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান মানব আচরণের সমস্ত বিভাগে প্রবেশ করেছে এবং নিজের অধিকারে তার আসন সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

মনোবিজ্ঞানের এই অন্তপ্রবেশ সর্ব্বত্রই বিরাট ও অকল্পনীয় পরিবর্ত্তন এনেছে। মনোবিজ্ঞানের বিচারে বহুক্ষেত্রে প্রাচীন সযত্ন-লালিত তত্ত্ব ভুল এমন কি ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বহু পুরাতন অমীমাংসিত সমস্যা, নব আবিষ্কৃত তথ্যরাশির আলোকনে নিঃসংশয় সমাধানে

পৌঁচেছে। তেমনই আবার কোন সমস্যার অবকাশ নেই বলে মনে করা হত এমন সবক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আধুনিক ব্যাখ্যায় নতুন করে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

যে সকল মানবসমস্যার রাজ্যে মনোবিজ্ঞান এইভাবে আলোড়ন এনেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল শিশুর আচরণ। এতদিন শিশুর আচরণকে আমরা বয়স্কদের মাপকাঠিতেই বিচার করে এসেছি। একটি শিশু-অপরাধী ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর মধ্যে আমরা প্রকৃতির দিক থেকে কোনরূপ পার্থক্য করতাম না এবং শাস্তির একই ব্যবস্থাপত্রও ধার্য্য করতাম। শিশু আচরণের যে কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা বা চিকিৎসা থাকতে পারে এ সত্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দান। শিশুর অপরাধ, অশোভন আচরণ, দোষত্রুটি, অসমঞ্জসতা প্রভৃতি এমন সব কারণ থেকে সৃষ্টি হতে পারে যার জন্য শিশু ত দায়ী নয়ই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার চারপাশের বয়স্করা তার জন্য দায়ী—এ মূল্যবান তথ্যটিও আজ মনোবিজ্ঞানের কাছ থেকে শেখা। মনোবিজ্ঞানের দেওয়া শিশু-অপরাধের এই নতুন ব্যাখ্যা প্রগতিশীল দেশমাত্রেরই চিন্তাবিদেরা মেনে নিয়েছেন। শিশুর আচরণ-সমস্যার যথার্থ রহস্য উদ্‌ঘাটনে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন এবং বহু নতুন নতুন তথ্যে তাঁদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। মেলানী ক্লীন, এ্যানা ফ্রয়েড, ভ্যালেণ্টাইন, গেসেল, গুডএনাফ, জাঁ পিয়াজে প্রভৃতি শিশু-আচরণ

অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা শিশু অপরাধের বিজ্ঞানসম্মত নানা চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের দেশে অবাঞ্ছিত শিশু আজ আর অবাঞ্ছিত নয়।

কিন্তু আমাদের দেশে এই অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাটি অতিমাত্রায় অবহেলিত। শিশুর আচরণকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখার মত দৃষ্টি আমরা এখনও পাইনি। শিশু সমস্যার সমাধানে আমরা এখনও বিগত শতাব্দীর পুরাতনপন্থী অনগ্রসর অভিভাবক। প্রাপ্তবয়স্কের তুলাদণ্ডে শিশুর আচরণকে আমরা এখনও পরিমাপ করি এবং সেই বিচারেই তার কোন্ আচরণটি বাঞ্ছিত ও কোন্ আচরণটি অবাঞ্ছিত সে সম্বন্ধে রায় দিয়ে থাকি।

সুখের বিষয়, শিশুসমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা সম্প্রতি আমাদের সুধীজনদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন আচরণের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সে সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নানা আলোচনাও হচ্ছে। তবে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এ সম্বন্ধে গবেষকদের মূল্যবান্ তথ্য ও নির্দ্দেশ সাধারণ জনগণের মধ্যে যত বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে তার সামান্য অংশমাত্রও আমাদের দেশে এখনও হয় নি। যেটুকু বৈজ্ঞানিক আলোচনা, তথ্য ও নির্দ্দেশ সাগরপার থেকে আমাদের দেশে এসে পৌঁচেছে, তার সবটুকুই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে পাঠ্যপুস্তক বা উচ্চস্তরের জটিল নিবন্ধের মধ্যে।

কিন্তু শিশু সমস্যা সম্বন্ধে আধুনিক গবেষকগণের পরীক্ষণলব্ধ

তথ্য ও নির্দ্দেশ অভিভাবক ও পিতামাতার দরজায় পৌঁছে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা এই বিরাট সমস্যাটি চিরকাল সমস্যা রূপে থেকে যাবে।

আমাদের বর্ত্তমান প্রকাশনীটি এই উদ্দেশ্যেই আয়োজিত। এ দাবী আমরা করছি না যে আমাদের এই বইটি সমস্যা পীড়িত পিতামাতার সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তবে তাঁদের সমস্যা-তিমির পথে কিছুটা আলোকপাত যে করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লেখক নিজে একজন শিক্ষক, মনস্তাত্ত্বিক ও বহু শিশু-সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত। শিশুর আচরণের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের আত্মিক পরিচয় আছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার উপর ভিত্তি করে তিনি শিশুদের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাই বইটি যে প্রতিটি শিক্ষকশিক্ষিকা পিতামাতার উপকার আসবে এ দাবীটুকু আমরা বিনাদ্বিধায় করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা…

ছোটদের মানুষ করার কাজে যাঁরা কোন-না-কোন রকমে জড়িত, তাঁদের জন্যেই বইখানি। এর আলোচনাগুলি ১৯৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, স্বাস্থ্যশ্রী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), সমাজকল্যাণ (পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষৎ) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং বহুলোকের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছিল। যাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় এখন সেগুলি গ্রন্থরূপ লাভ করতে পারল, তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

অবাঞ্ছিত শিশু

শিশু রাগ করে কেন ?

ভাষা যখন ফোটে

মেধাবী শিশু

খেলায় কাটে বেলা

কেন এত 'কেন' ?

কাঁদে শিশু

আঙুল চোষা

তোত্‌লামি

অবাঞ্ছিত শিশু

ছেলের নাম যদি হয় 'ফ্যালা' কিংবা 'পচা' আর মেয়েকে যদি ডাকেন 'আন্না' নয়তো 'খেঁদী' বলে, তা হলে চোখ-কান বুজে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, নামকরণের আগে থেকেই ওরা পৃথিবীর অনেক দুর্ভাগ্যের বোঝা কাঁধে নিয়েছে। 'নামে কী যায় আসে'—মানতে বাধা নেই। কিন্তু জানলে চমকে উঠতে হয়, ঐ ধরনের নামের পেছনে আছে অবচেতন মনের কী দুর্বিষহ প্রভাব!

'ফ্যালা', 'পচা', 'আন্না', 'খেঁদী'—এদের মা-বাবা হয়তো এ ধরনের আলোচনা খুব ভাল মনে নেবেন না। কেননা, অনেক মা-বাবাই নিজেদেরকে আপন ছেলেমেয়ের 'সোল-প্রোপ্রাইটর' বলেই দাবী করেন। সেক্ষেত্রে, আপন কাচ্চা-

বাচ্চার নামকরণের ব্যাপারে এরূপ কটাক্ষপাত বরদাস্ত করা

তাঁদের পক্ষে শক্ত, এ কথা অনস্বীকার্য্য। তাই, এই আলোচনার অবতারণার পেছনে যে কিছুটা দুঃসাহসিকতা আছে, মানতে হয়।

আসলে, প্রবন্ধের প্রারম্ভে নাম নিয়ে ভূমিকা করাটা একান্তই প্রাসঙ্গিক। আমাদের উদ্দেশ্য, আরও গভীরে পৌঁছান। তাই আরম্ভ করতে হবে অনেক আগে থেকে; শিশুর নামকরণ পেরিয়ে—প্রাক্-জন্ম পরিস্থিতি থেকে,—, যেখানে মানুষ খুঁজছে এক না-পাওয়া জিনিস, পেতে চাইছে কোন অনাস্বাদিত আনন্দের স্বাদ! বাবা-মা হওয়ার আগেকার সেই সময় থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু হবে। প্রাক্-অভিভাবকত্ব কালে মানুষের প্রাণে থাকে কত সাধ, মনে থাকে কত পণ। রঙীন স্বপ্নের মাদকতা তখন তার প্রতি স্নায়ুতে। সুখ এবং আনন্দের স্পৃহাই তখন তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু করুণ সুরের মূর্চ্ছনা পাই তখন, যখন ফ্যালা, পচা, আন্না, খেঁদী প্রভৃতির অনাবশ্যক আবির্ভাব ঘটে।

এখানে প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ তুলতে পারেন বাবা-মায়েরা, 'না, না, আমাদের কোন সন্তানই অবাঞ্ছিত নয়,—ওরা সবাই

আমাদের পরম কামনার ধন, নয়নের মণি—' ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি সত্যিই, এ-ধরনের আবেগজাত প্রতিবাদের একটা সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে। অভিভাবকদের যুক্তির সেইটুকু সামাজিক ভিত্তি মেনে নিলেও মনস্তাত্ত্বিক রহস্যটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। এই প্রতিবাদের মূলে যে মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল, মনোবিজ্ঞানে তাকে বলা হয় 'র‍্যাশ্‌নালাইজেশ্যন্' —বাংলায় বলতে পারি 'অপব্যাখ্যান'।

এ-কথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে এ-ধরনের অভিভাবক-অভিভাবিকা কেবল এ-দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই অল্পবিস্তর আছেন, যাঁরা এই সমস্যাকুল জগতে শিশুর আবির্ভাবে তাঁদের নিজেদের দায়িত্বটাকে খুব বড় করে দেখতে সাহস করেন না। ফলে শোনা যায়, "কী করি মশাই, সারাদিন দুটো পয়সার ধান্ধায় ঘুরছি—ছেলেমেয়েগুলোর দিকে কখন নজর দিই বলুন?" অতএব দিনের মধ্যে বড় জোর কয়েক মিনিট শিশু পায় বাবার সান্নিধ্য।

অভিভাবকের অর্থনৈতিক দীনতার যুক্তি এখানে উঠেই থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত মনে হলেও, আসলে এই যুক্তি অভিভাবকদের অনেকখানি সাহায্য করে এক গুরুদায়িত্ব

থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে! সন্তানের আবির্ভাবে প্রাক্-অভিভাবকত্ব যুগের মধু-স্বপ্ন যায় ভেঙে, এসে পড়ে এক অভাবিত বিরাট দায়িত্ব—এ-কথা আগেই বলেছি। 'ছেলের বাপ' হওয়ার ফলে কর্ম্মব্যস্ততা আর দুশ্চিন্তা যেন রাতারাতি যায় বেড়ে, পিতৃসুলভ মর্য্যাদাবোধ ও গাম্ভীর্য্য কোথা থেকে এসে জড়িয়ে ধরে আষ্টেপিষ্টে, নিতান্তই 'ছা-পোষা' মানুষ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু কটা দিন কাটলেই দেখা যায়, যাকে কেন্দ্র করে এত চিন্তা, এত ব্যস্ততা,—তার দাবি এতই বেশী, শুধু তাই নয়, এতই দুর্ব্বোধ্য আর রহস্যময় যে, কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, 'দুত্তেরি ছাই, ভাল আপদ জুটেছে!' মা-ও যেন কখন বলে ওঠেন, 'এমন ছেলে তো চাইনি, ঠাকুর!' বড় আদরের ধন, পরমবাঞ্ছিত নয়নের মণি ক্রমে এমনই হয়ে ওঠে, যাতে বাবা-মা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অবাঞ্ছিত শৈশবের সূচনা হয় এমনি করেই।

এই অপ্রীতিকর অবাঞ্ছিত শৈশব শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে করে তোলে অন্ধকার। মাতাপিতার কাছে তার একমাত্র যা চাইবার, তা হল স্নেহ। ধন, মান সে চায় না। কিন্তু সেই স্নেহটুকুর পিছনেও যদি থাকে বিরক্তির অহরহ ভ্রূকুটি, তা হলে শিশু পড়ে মুষড়ে। অভিভাবকদের অর্থনৈতিক দীনতা ছাড়াও আরো এক দীনতা অনেকেরই বিরক্তির পিছনে থাকে। তা হল শিশুপালন সম্পর্কে উন্নত জ্ঞানের অভাব। শিশুর মন ও দেহের পুষ্টি, তার কাঁচা ভাষা ও ভঙ্গিমা, তার তীব্র আকুতি, সাহায্যের

আবেদন—এ-সব বোঝবার অক্ষমতাই বাবা-মার অধিকাংশ ব্যবহারের মধ্যে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এনে দেয় শিশুর প্রতি যথাযোগ্য সহানুভূতির ক্রমাবনতি। অবশ্য প্রত্যেক বাবা-মা এক-একজন সুদক্ষ শিশু-বিজ্ঞানী হবেন আশা করা যায় না। তবে প্রয়োজন, সুসমঞ্জস দরদ, আর অক্ষুণ্ণ সহানুভূতির।

বাবা অফিস থেকে এসেছেন খেটেখুটে। ছেলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। আদরের বদলে পেল একটা ধমক। বাবা এখানে 'ব্যালান্স' হারালেন। বুঝলেন না যে, শিশুটি এতক্ষণ বাবার সান্নিধ্য না পেয়ে যে আবেগ রুদ্ধ রেখেছিল, তারই প্রকাশ হল ঐ কোলে ঝাঁপানিতে। আবেগ প্রকাশের রীতিটা তাঁর কাছে আপাতত বিরক্তিকর হলেও তার পিছনের সূক্ষ্ম প্রীতিবোধটুকু সর্ব্বদাই সহানুভূতি দাবি করে। যেখানে শিশুর যুক্তি-ক্ষমতা জাগেনি, সেক্ষেত্রে বাবার ধমক তার সূক্ষ্ম প্রীতিবোধের সুরেলা তারে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত করে, তার ফলে প্রীতিবন্ধনের হয় গুরুতর ক্ষতি। শিশুর রুদ্ধ আবেগের এই বিরক্তিকর প্রকাশ বন্ধ হওয়ার বদলে বেড়েই চলে, ক্রমেই সে হয়ে পড়ে বাবা-মায়ের অবাঞ্ছিত। যে শিশুকে আকাশে তুলে লোফালুফি করছেন 'যাদুমণি', 'সোনামণি'র
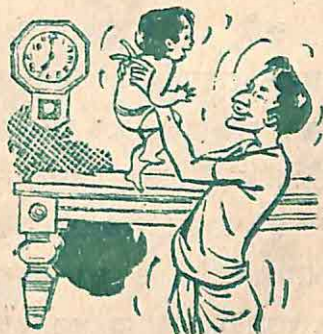
আদরে, দু ঘণ্টা পরেই যদি তার ওপর 'তাড়য়েৎ'-নীতি প্রয়োগ করতে হয়, তবে বুঝতে হবে আপনার দরদী মনের সামঞ্জস্যবোধ নেই।

বাপ-মায়ের অসংযত আবেগটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। হঠাৎ বাবা কেন রেগে উঠলেন, তা বুঝতেশিশুর বেশ অসুবিধা হয়। এই ধরনের আকস্মিক বিভ্রান্তি প্রায়ই ঘটতে থাকলে বাবার উপর একটা বিরূপ ধারণা গড়ে তোলে সে। নিজেকে সে অনেকখানি অসহায় মনে করে। এই অসহায় মনোভাবই তার মনে বিরূপ বা বিদ্রোহী শক্তি জাগিয়ে তোলে, যার ফলে সে বাবার ন্যায়-অন্যায় সব শাসনকেই তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে এবং ক্রমে হয়ে পড়ে 'বেয়াড়া'।

রুণ্টু সেদিন স্নান করতে গিয়ে বাবার মত নিজে নিজে জল ঢালতে চেয়েছিল। কিন্তু মা তা হতে দেননি। ফলে সে এমন হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে যে, জলের বালতি উল্টে যায়। হট্টগোলে বিরক্ত হয়ে রুণ্টুর বাবা এসে ওকে ঘা-দুচ্চার লাগিয়ে দেন। পরের দিন স্নানের সময় মা যখন ওর পোশাক খুলতে গেলেন, তখন ও শুরু করল প্রলয়নাচন। ওর ভাষা এখনও আধফোটা, তাই মা ওর কথা ঠিকমত বুঝলেন না। জোর

করে পোশাক ছাড়িয়ে যখন তেল মাখাতে শুরু করলেন, তখন আরম্ভ হল আবার পরিত্রাহি চিৎকার এবং যথারীতি আবার লাভ হল বাবার পিটুনি। মা রুণ্টুকে ওর বাবার কবল থেকে উদ্ধার করে স্নান করাতে নামালেন। সেখানেও সেই তাণ্ডব-নৃত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটায় অবশেষে মায়েরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল এবং চড়চাপড় চলল।

শিশুর নিরাপত্তাবোধ নষ্ট হয়ে কেমন করে অসহায়ভাব জেগে ওঠে, উপরের ঘটনাটি থেকে তা বোঝা সহজ হবে। রুণ্টুর একটা নির্দ্দোষ বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় এবং তার বদলে বাবার অসহানুভূতিসূচক ব্যবহারের ফলে রুণ্টু প্রথমে বাবার কাছে নিরাপত্তাবোধ হারাল। পরে মায়ের কাছে সহানুভূতি পাওয়ায় বিক্ষোভের মাত্রাটা অভিমানের তেজে একটু উগ্র হয়ে পড়েছিল, তাই মা-ও হারালেন ধৈর্য্য। এখন মা ও বাবা উভয়ের কাছ থেকেই নিরাপত্তাবোধ হারানর ফলে শিশুর

নিজস্ব ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই চাইবে নিজের শক্তিতেই নিজেকে নিরাপদ রাখতে, তাই সে হয়ে ওঠে গোঁয়ার। বাবা-মার সহানুভূতি পেলে এটা হতে পারত না।

প্রথম বিবাহিত জীবনের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই মনে রাখা উচিত, এর পরে আসছে এক গুরু দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার প্রস্তুতি বাবা-মা উভয়েরই প্রয়োজন। কেবল 'নতুন আগন্তুক'-এর জন্যে প্রাণভরা দরদ আর তার জন্যে সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও পরিকল্পনার জাল-বোনাটাই এই প্রস্তুতি নয়। তার জন্যে উপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয় করাটাও এই প্রস্তুতির অঙ্গ। ভাবী শিশুর দাবি-দাওয়া আর রকমারী প্রয়োজন মিটাবার মত আর্থিক, দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি চাই। এই প্রস্তুতির অক্ষমতা থাকলে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করাটাই অপরাধ—একথাটা অপ্রিয় হলেও, আজ স্পষ্ট করে বলবার দিন এসেছে।

ছেলেমেয়েদের দোষগুণ, স্বভাব-চরিত্র গড়ে ওঠে দুটি জিনিসের অনুবন্ধে। তার একটি হল শিশুর বংশধারা অর্থাৎ বাবা ও মায়ের সংমিশ্রিত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব। একথা আজ সবাই জানে ও মানে। বাবা-মায়ের প্রাণকোষ থেকেই শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন জন্ম। তাই শিশু যা নিয়ে এজগতের আলো দেখে, তা পুরোপুরিই বাবা-মা'র কাছ থেকে নেওয়া—একথাটা এড়িয়ে চলা কোন বাবা-মায়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। বাবা-মায়ের কোনও মানসিক বা দৈহিক ত্রুটি থাকলে তার কিছু-না-কিছু

শিশুকে গ্রহণ করতেই হবে। মুশকিল হল এই যে, বাবা-মা তাঁদের নিজেদের মানসিক ত্রুটি যে কোথায়, সেটা ধরতে পারেন না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর কোন অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপের জন্যে শিশুকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে, শিশুর ভাবসম্পদের অনেকাংশই বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

এখানে আর-একটি প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে। বাবা-মায়েরা বলবেন, ছেলেমেয়েদের দোষগুণ, স্বভাব-চরিত্র গড়ে ওঠে যে দুটি জিনিসের প্রভাবে, পরিবেশও তাদের মধ্যে একটি। তবে ছেলেমেয়েদের দোষগুণের জন্যে পরিবেশকেই বেশী দায়ী করা হবে না কেন? এর পাল্টা প্রশ্ন জাগে: 'কিন্তু শিশুর প্রাক্-জন্ম এবং প্রাথমিক পরিবেশ রচনা করেন কারা? তাঁরা কি মা-বাবা নন?' পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে প্রাক্-জন্ম পর্য্যায়ের উল্লেখ শুধু এ-যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাই করেন না, এ-দেশের মনীষীরাও সে-সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার আগেও মাতৃগর্ভে চলে পরিবেশের প্রভাব এবং আমরা বলতে চাই যে, সেই প্রভাবের জন্যে অনেকাংশে বাবা-মা সংজ্ঞানে না হলেও, দায়ী।

ভূমিষ্ঠ হবার পরেও শিশুর প্রাথমিক পরিবেশের গণ্ডী বাবা-মাকে ছাড়িয়ে বড় একটা বাইরে যায় না। এই প্রাথমিক পরিবেশ, ছমাসেই হক আর দু-তিন বছরেই হক, মানুষের মানসিক জীবনের বনিয়াদ গড়ে দেয় খুব পাকা করেই।

আমরা মনে করি, ছেলেমানুষ, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বড় হলে যেটুকু সংশোধন হয়, সেটুকু হয় তীব্র অবদমনের দ্বারা, স্বাভাবিক সংশোধন নয়। মনোবিজ্ঞানী য়ুঙ্-এর বর্ণনা-মত একে এক দ্বীপের সঙ্গে তুলনা করা যায়—যার একেবারে ভিত্তিতে আছে এক আগ্নেয় স্তর। কালের প্রভাবে তার ওপর দ্বীপ গড়ে উঠলেও আগ্নেয় স্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে আকস্মিক ভূকম্পনে, যদিও ভূ-কম্পনের কারণ নির্ণয় ও দূর করা আর তখন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তাই বলি শিশুকে ভালবাসুন, স্নেহ দিয়ে তাকে জয় করুন। সে যে স্নেহেরই কাঙাল।

শিশু রাগ করে কেন ?

শিশু কেন কারণে-অকারণে ক্ষেপে ওঠে, হাত-পা ছুঁড়ে অবাধ্যতার পরিচয় দেয়—সেকথা বোঝা যেমন শক্ত, তেমনিই আবার ঐ-ক্রোধকে প্রশমিত করার উপায় নির্দ্ধারণ করাও বিশেষ আয়াসসাধ্য। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানে শিশুর ক্রোধ সম্পর্কে যে সমস্ত গভীর গবেষণা করা হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে এখন ক্রোধের কারণ ও প্রশমনের বিভিন্ন উপায় নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

প্রত্যেক অভিভাবকেরই উচিত শিশুর ক্রোধকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করা। নানা কারণে ক্রোধের উৎপত্তি হতে পারে শিশুর মনে ; তার মধ্যে কোন কোনটির প্রতিক্রিয়া শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করে তার ভবিষ্যৎ জীবনে

অনেক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এখানে কেবল ১০ বছরের নীচের ছেলেমেয়েদের কথাই বলা হচ্ছে। এই সব বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্রোধের উৎপত্তি হয় বিরক্তি থেকে। পোষাক পরা, স্নান করা, খাওয়া—এমনি নানা সামান্য ব্যাপারে শিশুর ইচ্ছা প্রতিহত হলেই সৃষ্টি হয় বিরক্তির এবং পরে ক্রোধের।

ক্রোধের প্রথম স্তরে নয়টি শ্রেণীতে ক্রোধকে বিচার করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে অকারণ ক্রোধ। এই ধরনের ক্রোধই সকলের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এর কারণ অত্যন্ত অস্পষ্ট। অস্পষ্ট এই কারণে যে, অনেকগুলি বিরক্তির সংমিশ্রণে হঠাৎ এই রাগের সৃষ্টি হয়। ফলে, শিশুরা হাতের খেলনা কামড়াতে থাকে, হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে ফেলে, দরজা-জানালা দমাদম বন্ধ-খোলা করতে থাকে। বড়দের মধ্যেও এধরনের ক্রোধ অনেককে আক্রমণ করে, তাও আমরা দেখেছি।

দ্বিতীয় ধরনের ক্রোধ হল কোন বাধা অতিক্রমের ইচ্ছাকে কেন্দ্র ক'রে। বাধা দূরীভূত হলেই ক্রোধ কমে। তৃতীয়তঃ আক্রমণাত্মক ব্যবহারের আশঙ্কায় ক্রোধের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় সতর্কবাণী কিংবা শাসানি। চতুর্থতঃ অতীতের কোন আঘাত বা ক্ষতির প্রতিশোধে শাস্তির মনোভাবকে ভিত্তি করে উৎপন্ন ক্রোধ। পঞ্চমতঃ পশুদের মধ্যে দল-নেতৃত্বের যে আদিম প্রবৃত্তি আছে, ঠিক তারই মত মানুষের নেতৃত্ব-প্রবৃত্তিকে

নিয়েই এই ক্রোধের সৃষ্টি। অর্থাৎ সমবয়সীদের মধ্যে নেতৃত্বের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবহেলিত হলে ক্রোধের সাহায্যে ঐ নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। আদিম ক্রোধের শ্রেণীবিভাগের ষষ্ঠ শ্রেণীতে আসে সহানুভূতিশীল ক্রোধের কথা। অপরের ক্রোধের সহানুভূতিতে এই ধরনের ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

এই ছয়টি আদিম ক্রোধ ছাড়া স্বভাবের দ্বারা প্রাপ্ত আরও তিনটি ক্রোধ মানুষের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এদের মধ্যে একটি হল মনের কোন কষ্টের রূপান্তরে যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। যেমন, অপমানিত হবার পর যে ধরনের ক্রোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ধরনের ক্রোধ প্রতিশোধ চায় না, বাধা অতিক্রম চায় না, বা তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে কিছুই করতে চায় না। শুধু মর্ম্মান্তিক কষ্টের একটা অভিব্যক্তি হিসেবে এই 'করুণ' ক্রোধটির প্রকাশ হয়। এটিকে অনেকে 'ক্ষোভ' নামে অভিহিত করে থাকেন।

শিশুরা দুষ্টুমি ক'রে রাগের ভান করে, এ ধারণা মোটেই করা উচিত নয়। তাদের ক্রোধ বিরক্তি সবকিছুর একটা-না-একটা কারণ আছেই আছে। যেমন, স্নান করতে বা খেতে যাওয়ার সময় শিশুদের

অনেকে দারুণ অবাধ্যতা করে। বুঝতে হবে তাদের খেলার মধ্যে বাধা পড়লেই এরকম করে থাকে। কিন্তু বিশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে দৈনিক কার্য্যতালিকার মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান, খাওয়ার ব্যবস্থা রাখার ফলে শিশুর এসব বিষয়ে ক্রোধ অনেক কমে যেতে দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে, স্নানের ব্যাপারে ছেলেদেরই বেশী অবাধ্য হতে দেখা যায়।

কোন কোন সময়ে শিশুদের মধ্যে একটা স্বাবলম্বী ভাব জেগে ওঠে। এই সময়ে সে নিজের কাজ নিজেই করতে চায়; বাধা পেলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। এ সময়ে শিশু কোন সহায়তা চায় না, 'শিশু' বলে 'জোর করে' সহায়তা করতে গেলে তাদের ক্রোধেরই কারণ সৃষ্টি করা হয়। আবার নিজে নিজে কোন কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও শিশু ভয়ানক রেগে যায়। এরকম হয় সাধারণতঃ দুই থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে। এরকম অবস্থায় তাদের সফলতার জন্যে কিছু কিছু সহায়তা করতে পারলে শিশুর কাছে খুব প্রিয় হওয়া যায়।

পোষাক পরার সময়ে ছেলেমেয়েদের বিরক্তির কারণ কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক। দেখা যাবে, খুব অল্প বয়সের শিশুর চেয়ে একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, যেমন ৫।৬ বছর বয়স থেকে পোষাক পরার সময়ে ঘ্যান্-ঘ্যানানি সুরু হয়। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই পোষাকের খুঁত-খুঁতানি বেশি দেখা যায়। পোষাক পরার প্রথম অভ্যাস কষ্টকর এবং দ্বিতীয়তঃ পছন্দমত পোষাক না হলেই এই ধরনের বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

খেলাধুলার মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে মতের অমিল হলে, খেলার মাঝে হঠাৎ শুতে যেতে বললে শিশুরা বিরক্ত হয়। আকস্মিকভাবে কোন জিনিষের অবতারণা করলে শিশুরা প্রথমে ভয় পায়, তারপরেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। আকস্মিক মানসিক আঘাতে স্নায়বিক চাঞ্চল্যের জন্যে এই ধরণের প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ক্রোধ আর কিছুই নয়,—মনের ভারসাম্য-হারানো-অবস্থাকেই ক্রোধ বলা চলে। অতএব শিশুর রাগ কমাতে হলে এবং রাগ প্রশমিত করতে হলে সবসময় তার মনকে সুস্থ রাখার জন্যে সকলকেই চেষ্টা করতে হবে। শিশুর মনকে সুস্থ ও শান্ত রাখতে হলে অভিভাবকের সযত্ন দৃষ্টি ও ব্যবহার যেমন অত্যন্ত প্রয়োজন—তেমনি প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশের।

ধমকানি, যুক্তি দিয়ে বোঝানো ; শাসানো, ভয় দেখানো, মিষ্টি কথায় ভোলানো, দু'একটা লজেন্স বিস্কুট দিয়ে ভোলানো ; পিঠ চাপ্‌ড়ে বাহবা দেওয়া, বিদ্রূপ করা, মানসিক করুণভাবকে জাগানো (যেমন 'মায়ের অসুখ করেছে, তুমি দুষ্টুমি কোরো না'), কৌতুক সৃষ্টি করা, চড় চাপড় মারা, সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া, একঘরে করে দেওয়া, খাবার বন্ধ করা, চুপ করিয়ে বসিয়ে বা শুইয়ে রাখা, রাগের কথায় কান না দেওয়া অর্থাৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, শিশুর মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করা, রাগের কারণ দূর করা, অন্যান্য শারীরিক শাস্তি দেওয়া, পাঁচজনের নিন্দা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব পদ্ধতিকেই সচরাচর আমরা কাজে লাগিয়ে থাকি শিশুর ক্রোধ প্রশমিত করতে। কোন

কোন ক্ষেত্রে শিশু এই সব পদ্ধতির কাছে হার মানে, কোথাও বা পদ্ধতি ব্যর্থ হয়; আবার কোথাও বা পদ্ধতি আর শিশুর জিদ উভয়ের মধ্যে একটা রফা করতে হয়। সত্যি সত্যি ঠিক কোনরকম ক্রোধ প্রকাশ পেলে 'কত নম্বর' পদ্ধতি কাজে লাগালে একেবারে অব্যর্থ হবে, তা কোনমতেই বলা সম্ভব নয়। শিশুর মন বিভিন্ন রকম; তার পরিবেশ, ক্রোধের কারণ, মেয়াদ, সব কিছুতেই কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকে। এ অবস্থায় স্থান, কাল, পাত্রভেদে ক্রোধ প্রশমনের সঠিক পদ্ধতি অভিভাবক-অভিভাবিকাকেই বেছে নিতে হবে। কোন্ শিশুকে কিভাবে শান্ত করতে হবে, তা কিছুদিন অনুধাবন করার পর বেশ বোঝা যায়। ধমকানি দিয়েই অধিকাংশ অভিভাবক ছেলেমেয়েদের শান্ত করতে চান। কিন্তু ধমকানির ফল হয় ক্ষণিক। দেখা গেছে শতকরা মাত্র দুটি ক্ষেত্রে ধমকানির সাহায্যে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

বুঝিয়ে বলার বয়সটা একটু বেশী হওয়া দরকার অর্থাৎ তিন চার বছরের আগে ছেলেমেয়েরা বোঝাবুঝির ধার ধারে না। তবে এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাদের বুঝিয়ে বলা ছাড়া আর কোন পন্থা কাজে খাটে না। সেই ধাত বুঝে কাজ করতে হবে।

'অমুকটা না করলে শাস্তি দেব'—এ-ধরনের শাসানি তিন বছরের পর আর কাজে লাগানো উচিত নয়। ভয় দেখানো (জুজু ইত্যাদির) জিনিষটাও একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। এগুলির দ্বারা ফল বিপরীত হতে দেখা যায়।

দু একটা লজেন্স বিস্কুট উৎকোচ দিয়ে রাগ থামানোর পদ্ধতিটা বাচ্চাদের ব্যাপারে বেশ কার্য্যকরী হয়, কিন্তু বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতি কমিয়ে ফেলা একান্ত প্রয়োজন।

ভাল কাজের প্রশংসা করে শিশুর ক্রোধ প্রশমন করার কথাটা অদ্ভুত মনে হলেও এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রদ হতে দেখা যায়। এর সাহায্যে শুধু যে রাগটাই কমে যায়, তা নয়—রাগ করা স্বভাবটাও কমতে থাকে। ক্রমশঃ একটা শুভ আত্মমর্য্যাদা বোধ জেগে উঠতে থাকে।

চড়চাপড় মারার অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করা উচিত। দেখা গেছে, চড়চাপড় না মেরে শিশুর হাত বা কাঁধ ধরে সামান্য একটু ঝাঁকানি দিলে ঠিক চড়চাপড়ের মতই কাজ হয়। কিন্তু চড়চাপড়ের অপকারিতা হচ্ছে এই যে, চড়দাতার প্রতি শিশুর মন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠে। ঝাঁকুনির সুবিধা এই যে, ঝাঁকুনি দেওয়া হল যে হাত দুখানি দিয়ে, তা দিয়ে আবার আদর করে শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরতেও পারা যায় এবং এতে করে শিশুর কোমল মনকে অতি সহজে অত্যন্ত গভীরভাবে স্পর্শ করা যায়। কিছু স্নেহ, কিছু সহানুভূতি, শিশুর এই-ই তো সম্বল। সে তো ধনরত্ন মণিমাণিক্য চায় না, তার মনের অব্যক্ত ভাষা বুঝে স্নেহ দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে তাকে জয় করতে পারাটাই আসল কাজ।

যে কোনও শারীরিক শাস্তির কারণ হচ্ছে অভিভাবকের ব্যক্তিত্বের অভাব এবং তাঁর নিজের মনের ওপর কর্তৃত্বের অভাব।

শিশুর ক্রোধ প্রশমনে কোন অভিভাবকেরই অধীর হওয়া শোভা পায় না। সব সময় নিজের শৈশবের কথা মনে রাখলে শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যায়। স্নেহ আর সহানুভূতি এই দু'টি হারালে শিশু নিঃসহায় হয়ে পড়ে। শিশুর পরিচর্য্যায় রত সকলেরই একথা মনে রাখা উচিত।

একটি ছোট্ট মেয়ে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে কাজ করতে খুব আনন্দ পেত। একদিন মা এক গামলা আলুসেদ্ধ রান্নাঘর থেকে ওপরতলায় নিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েটি বায়না ধরল, সে ঐ গামলাটা নিয়ে যাবে। কিন্তু সেটি আলুসমেত বেশ ভারী ছিল বলে মা দিতে রাজী হলেন না। মেয়েটি কেঁদে কেটে সারা। মা বুদ্ধি করে করলেন কি, একটা ছোট ডিশে চারটে বড় বড় আলু দিয়ে বললেন, 'তুমি এগুলো নিয়ে ওপরে চলো, বাকীগুলো আমি নিয়ে যাই।' মহানন্দে মেয়েটি ওপরে নিয়ে চলল সেই আলুর পাত্রটি!.... কত সহজে এই ক্রোধের প্রশমন করা সম্ভব হল! এমনি করেই শিশুর সাধ্যমত তাকে তার দাবী মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

দেখা গেছে, খুব ছেলেবেলায় রাগ কমাতে এটা-ওটা উৎকোচ প্রদান, রাগের বিষয় থেকে শিশুর মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করা, রাগের কথায় কান না দেওয়া—এইসব পদ্ধতি বেশ কার্য্যকরী হয়। কিন্তু বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো কমাতে হয় এবং তখন ধমকানি, শাসানি, এককোণে চুপটি করে বসিয়ে রাখা—এগুলোর কার্য্যকারিতা বাড়তে থাকে। আরও

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, মেয়েদের রাগে কেবলমাত্র উদাসীনতা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দেখালেই অনেক সময়ে রাগ পড়ে যায়।

উদাসীনতা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিই। একটি ছেলে প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার সময়ে খেলা করত। জোর করে খাওয়াতে বসালে অত্যন্ত দুরন্তপনা করে রাগ দেখাত। একদিন করা হল কি, শিশুকে একবার মাত্র খেতে ডাকার পর বাড়ির সকলে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খানিকপরে শিশুটি খেতে চাইলে খুব উদাসীনতার সঙ্গে বলা হল, "খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার তো হয়ে গেছে অনেক আগে, তুমি আবার বিকেলে খেয়ো!" একদিন এমনিটি করতেই পরের দিন থেকে দেখা গেল, এক ডাকেই ছেলে খাবার ঘরে হাজির! তবে একথা ঠিক যে, একই ধরনের পদ্ধতি সব জায়গায় খাটেনা। 'বোতাম টিপে দিলেই কাজ হবে' এরকম পরামর্শ মনোবিজ্ঞানে চলে না। বিভিন্ন শিশুর স্বাস্থ্য, বংশগত

অভ্যাস, পরিবেশ—সবকিছুর ওপর তার মনের অবস্থা নির্ভর করে এবং সেই মতই তার ব্যবস্থা করতে হয়।

সবশেষে, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ক্রোধের উৎপত্তি ও প্রশমনের কয়েকটি পার্থক্য ও সামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করব। রাগের উৎপত্তি, স্থিতিকাল ও প্রশমনের পদ্ধতি নিয়ে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বেশ প্রভেদ দেখা যায়, সবাই তা জানেন। ক্রোধ প্রশমনের সময়ে এগুলি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। ছেলেদের ব্যাপারে রাগের পর মুখ গোমড়া করে থাকা, গুমরে কাঁদা, খিট্‌খিটে ভাব, এগুলি বেশী না দেখা গেলেও, মেয়েরা কিন্তু এগুলো এড়িয়ে থাকতে পারে না। ছেলেরা যত সহজে ধমকানি-বকুনি বা শাস্তি হজম করে ফেলে, মেয়েরা তা পারেনা। তাই সমস্ত পদ্ধতির একটু রকমফের করে কাজে লাগানো উচিত।

আজকাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সমস্ত মানসিক অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে, তার জন্যে সকল শিক্ষক ও অভিভাবকেরই শিশুর মন নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। পরিবেশ, অর্থনৈতিক বিপর্যয় আর বিশৃঙ্খল সঙ্গদোষ থাকলেও কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকারা, অভিভাবক ও অভিভাবিকারা ছেলেমেয়েদের জন্যে এখনো অনেক কিছু করতে পারেন। সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থাকে দোষ দিয়ে তো আর আপন ছেলেমেয়েকে দোষমুক্ত রাখা সম্ভব নয়!

ভাষা যখন ফোটে ...

আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ছোট্ট খোকাটি যখন 'ওঁয়া'-জাতীয় একটি শব্দ উচ্চারণ করছে, তখন তার কী মনোভাব ব্যক্ত হচ্ছে, তাহলে আপনি বলতে পারেন, সে হয়ত খাবার চাইছে। আরেকজন এ-প্রশ্নের জবাবে স্বচ্ছন্দেই বলবেন, শুধু যে খাবার চাইছে তারই-বা কী মানে আছে—নানারকম অস্বস্তির অভিব্যক্তি হতে পারে ওই একটি 'ওঁয়া'-শব্দের মধ্যে দিয়ে। আবার তৃতীয় এক ব্যক্তি একটু বৈজ্ঞানিক কায়দায় বলতে চেষ্টা করবেন, ও-সব খিদে-অস্বস্তির কথাটা আসল নয়, আসলে শিশুর নতুন আনকোরা শ্বাসযন্ত্র, মাংসপেশী আর রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে শুরু হবার প্রয়োজনে যে প্রচুর অক্সিজেন গ্রহণের দরকার হয়,

তার ফলে শিশুর অপরিণত ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর আকস্মিক প্রচণ্ড ব্যস্ততা এবং তজ্জনিত নালীর বিশেষ প্রসারতা ও সঙ্কোচন ঘটার ফলে ঐরকম 'ওঁয়া'-শব্দের সৃষ্টি হয়। শিশু সংজ্ঞানে ঐ শব্দ করে না।

কথাগুলি প্রত্যেকটিই ঠিক, তবে কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ শিশুর সমস্ত ওঁয়া-শব্দেরই একটিমাত্র কারণ নেই। বিভিন্ন অবস্থায় একই ওঁয়া-শব্দের বিভিন্ন রকম কারণ থাকতে পারে। অবশ্য একটা বিষয়ে এই বিশেষ শব্দটির গুরুত্ব সবসময়েই সমান,—সেটা হল শিশুর ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে।

পৃথিবীর মাটির স্পর্শলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু যে কান্না শুরু করে, এতদিন মানুষ তার নানারকম দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করে এসেছে। আজকের বিজ্ঞানীরা সকলেই একমত হয়েছেন যে, নবজাত শিশুর জন্ম-ক্রন্দনের পেছনে তার অক্সিজেন-গ্রহণের প্রথম অভিজ্ঞতাটাই একমাত্র কারণ।

সে যাই হোক, এই জন্ম-ক্রন্দন থেকেই শুরু হয়ে যায় শিশুর ভাষাবিকাশের কাজ। বাক্-যন্ত্রের যে সুনিপুণ কর্ম্মক্ষমতার প্রয়োজন হয় মানুষের ভাষাদক্ষতা অর্জ্জনে, তার তালিম একেবারেই জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। অবশ্য 'ভাষা' বললে আমরা কেবল বাক্-যন্ত্র-নির্গত কতকগুলি শব্দ-প্রতীককেই বুঝব

না ; কথা-বলা, লেখা, ছবি আঁকা, অঙ্গভঙ্গী এমন কি নকশা-মানচিত্রকেও 'ভাষা'-র পর্য্যায়ে নিশ্চয়ই ফেলা চলে। কারণ ভাষার একটি প্রধান কাজ হল ভাব প্রকাশ করা।

লালটু যখন এক টুক্‌রো চক্ পেন্সিল হাতে পেয়ে মেঝের উপর অদ্ভুত-কিম্ভূত রকমারী আঁকাজোখা চালিয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই সে তার কোন-না-কোন ভাবপ্রকাশে ব্যস্ত। আবার যখন তার নবাগত ভাইটি বিছানার পাশের রঙিন খেলনাটি ধরবার জন্মে হাত-পায়ের অঙ্গ-ভঙ্গী করতে থাকে, সেটাও তার একটা ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। অনেকে আবার চিন্তা-লহরীকেও 'নীরব ভাষা' বলে অভিহিত করে ভাষার মর্য্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ-কথা খুবই সত্যি যে, ভাষার সাহায্য না পেলে চিন্তালহরীর ছন্দে কেবলই বিপর্য্যয় ঘটতে থাকে।

অতএব শিশুর ভাষা কেমন করে ফুটে উঠছে, তা জানতে হলে এসব গুলিই ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে। অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে ভাবপ্রকাশ করার রীতিটা একেবারেই পশুস্তরের, এবং ৮।৯ মাস পর্য্যন্ত শিশু দৈনিক যতক্ষণ জেগে থাকে, তার মধ্যে প্রায় ৮০-৯০% সময়েই এই রীতির সাহায্যে সে ভাব প্রকাশ করে থাকে। অবশ্য এই সঙ্গে বৈচিত্র্যহীন অল্প অল্প শব্দযোজনার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে মানব-ভাষার পরম

বৈশিষ্ট্য সুনিপুণ শব্দতরঙ্গ সৃষ্টির কোনও লক্ষণই থাকে না বলতে গেলে। অর্থাৎ ৮।৯ মাস পর্য্যন্ত সাধারণত মানব-শিশুর ভাষাবিকাশ পশুস্তরেই থেকে যায়। কিন্তু তাহলেও এই সময়টাতেই তার শব্দজ্ঞানের বনিয়াদ গড়ে উঠতে থাকে, সেটা মনে রাখতে হবে।

এই বনিয়াদ কেমন করে গড়ে ওঠে, সে ভারী বিস্ময়কর ব্যাপার। পশুস্তর থেকে মানুষ যেমন কঠোর পরিশ্রম করে সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠেছে, ভাষা আয়ত্ত করবার ব্যাপারেও শিশুর মধ্যে দেখি তেমনি পরম অধ্যবসায়। ভঙ্গী-ভাষার প্রাচুর্য্য ক্রমশই কমতে থাকে, শিশুর বাক্-যন্ত্র পরিপুষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে। আবার এই শাব্দিক ভাষা-চর্চ্চার প্রথম স্তরে শিশু অবলম্বন করে স্বরধ্বনিগুলিকে। স্বরধ্বনি নিয়ে প্রথম মাসছয়েক কেটে যাবার পর ধীরে ধীরে ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব শুরু হয়।

স্বরধ্বনিই বলুন আর ব্যঞ্জনধ্বনিই বলুন, প্রথম ৮।৯ মাস পর্য্যন্ত শিশুর সমস্ত শাব্দিক ভাষাকেই প্রতিবর্ত্তী ক্রিয়ার পর্য্যায়ে ফেলতে হবে।

'প্রতিবর্ত্তী ক্রিয়া' বলতে আমরা বুঝব সেই সমস্ত শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যেগুলির অধিকারী আমরা হয়েছি একরকম বিনা

শিক্ষায়, কতকগুলি সহ-জ স্নায়বিক কৌশলের ফলস্বরূপ। চোখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি পড়লে আমরা চোখ বন্ধ করি, এর জন্যে কোনরকম শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন হয় না। তেমনি শিশুর যখন খিদে পায়, তখন সে প্রতিবর্ত্তী ক্রিয়ার খাতিরেই হাঁ করে এবং স্বরধ্বনির সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে কোন একটি সুচিন্তিত ভাবপ্রকাশের সুনির্দ্দিষ্ট প্রতীক হিসেবে সংজ্ঞানে শিশু এই শব্দগুলির সৃষ্টি আদপেই করে না। একটা তীব্র আন্তর প্রয়োজন শিশুর বাক্‌যন্ত্রকে উদ্দীপিত করে এবং রকমারী শব্দের সৃষ্টি হয় নিতান্তই সার্ব্বজনীন প্রক্রিয়ায়। এখানে বড়দের অনুকরণের কোন প্রশ্ন ওঠবার সুযোগ নেই ; কারণ, অনুকরণের জন্যে যে অনুধাবন-ক্ষমতার প্রয়োজন, শিশু এখনও তার অধিকারী হয়নি।

এর মধ্যেও আবার দুটি স্তর পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। প্রথম দিকে যখন শিশু জিভের পেশী সঞ্চালনের কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না, তখন সে উচ্চারণ করে সম্মুখাবস্থিত স্বরধ্বনি—ই, এ, অ্যা। যতই তার জিভের উপর কর্ত্তৃত্ব বাড়ে, ততই ফুটে ওঠে পশ্চাদবস্থিত স্বরধ্বনি—আ, অ, ও, উ। লক্ষ্য করলে দেখবেন,—ই, এ, অ্যা এই স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে গেলে জিভের এবং আ, অ, ও, উ এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে হলে ঠোঁটের ব্যবহারের দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এ সমস্তই শিশুর ক্রমিক পুষ্টির উপর পুরোপুরি নির্ভর করে।

ঠোঁটের পুষ্টির সঙ্গে স্তন্যপানের একটি গভীর সম্পর্ক আছে এবং মূলত স্তন্যপানের অভ্যাসের ফলেই শিশু ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টির কাজে বেশ খানিকটা সহায়তা লাভ করে। মাসসাতেক বয়সে শিশুর মুখে প্রথম যে ব্যঞ্জনধ্বনির বিস্ময়কর ঝঙ্কার শুনে ছোটবড় সকলেই পুলকিত হয়ে উঠি, সেই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হল ওষ্ঠধ্বনি 'ম' এবং 'ব'—কখনও-বা 'প'। অতএব শিশুর ব্যঞ্জনধ্বনি বিকাশের পথে জিভের পরেই একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে আছে ঠোঁট দুখানি।

কোন কোন শিশুবিৎ বলেন, স্তন্যপান এবং ওষ্ঠসঞ্চালন—এই দুটির মধ্যে যে পুলকসঞ্জাত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়, তারই ফলে খিদে না পেলেও কেবলমাত্র ঐ পুলকটি খুশিমত লাভের উদ্দীপনাতেই ঠোঁট দুটির উপর অকারণে চাপ দিয়ে শিশু একরকম 'ম্ ম্ ম্'-শব্দ করতে থাকে। পরে এই শব্দটিই 'মা', 'মাম্মা'-জাতীয় শব্দ রূপান্তরিত হয়। 'বা-বা'-শব্দের সৃষ্টির মূলেও ঐ একই কারণ আছে নিশ্চয়ই। ফ্রয়েডপন্থী কোন কোন বিজ্ঞানী আবার এই ধরনের ওষ্ঠ্যধ্বনির মধ্যে শিশুর যৌনমূলক-প্রবৃত্তির গন্ধও পেয়েছেন। এটা ঠিকই যে, কামস্থানগুলির মধ্যে ঠোঁট

অন্যতম এবং ফ্রয়েডের বিস্ময়কর তত্ত্ব 'শৈশব কামধর্ম্ম' প্রসঙ্গেই এর গুরুত্ব সবপ্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়।

এতক্ষণ আমরা ধ্বনিস্বৃষ্টির বনিয়াদ নিয়েই আলোচনা করেছি। এইবার আসুন দেখা যাক, সংজ্ঞানে মানবীয় ভাষাশিক্ষার দুরূহ ব্রতে শিশু কেমন করে দীক্ষা গ্রহণ করে। স্বাভাবিক শিশুরা ৯।১০ মাস বয়স থেকেই এ-বিষয়ে মনোযোগী হয় দেখা গিয়েছে। এই সময় থেকেই শিশু বড়দের ভাষার স্বরকম্পন অনুকরণ করবার চেষ্টা করে, এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'বাবা, দাদা, মামা'—এসব শব্দ এই সময়ে সে শিখে ফেলে এই কারণেই।

স্বরকম্পন-অনুকরণের এই বয়সটি মানবীয় ভাষাশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়। এ সময়ে বড়দের কাছে শিশু যেমন-শব্দ শুনবে, তার অনুকরণের বিশেষ চেষ্টা করবে। তাই বড়রা অকারণে বিকৃতভাবে শিশু-ভাষা ব্যবহার করলে এ সময়ে শিশুর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়, কারণ এর ফলে যথাযথ উচ্চারণ শিখতে তার অযথা দেরী হয়ে যায় এবং ভাষাবিকাশে সে পিছিয়ে পড়ে। তাই ৯।১০ মাস বয়স থেকে শিশুর সামনে সর্ব্বদাই সেই জাতীয় শব্দই উচ্চারণ করবেন, যা আপনি তাকে সেখাতে চান। মনে রাখবেন, উচ্চারণ-শেখার এই পর্য্যায়ে শিশু কোনরকমে পিছিয়ে পড়লে পরবর্ত্তী প্রত্যেকটি পর্য্যায়েই তাকে পিছিয়ে থাকতে হবে এবং স্কুল-শিক্ষার স্তরেও তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হতে পারে।

বলে রাখা ভাল, মাস-নয়েক বয়স থেকে শিশুর মধ্যে এই যে স্বরকম্পন-অনুকরণ-প্রবৃত্তি দেখা যায়, এর পিছনে শব্দের অর্থগত জ্ঞান আহরণের কোন প্রচেষ্টাই থাকে না। কোন মানে না বুঝেই এই সময়ে শিশু রকমারী শব্দ উচ্চারণ করে চলে। বছর দেড়েক বয়স হলে তখন শব্দের অর্থবোধ ধীরে ধীরে জাগতে শুরু করে। এবং সেই সময় থেকে ভাষার স্পষ্টতাও বাড়তে থাকে। এ-বিষয়ে মেয়েরা খানিকটা পিছিয়ে থাকে ছেলেদের তুলনায়, অবশ্য সেটা খুব বেশি নয়।

শিশু যখন বসতে শেখে, তখন তার মুখ-গহ্বরের এবং জিভের অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন ঘটার ফলে ব্যঞ্জন-ধ্বনি উচ্চারণের আর একটি পথ খুলে যায়। বিশেষ করে মহাপ্রাণ ধ্বনি, যেমন খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি এবং ন-জাতীয় অনুনাসিক ধ্বনিগুলি এই সময়েই শিশুর মুখে ফুটতে থাকে। এছাড়া শক্ত খাবার খাওয়া, দাঁত ওঠা, চলতে শেখার সঙ্গেও শিশুর ভাষা-বিকাশের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে হাঁটতে শেখার সময়টা এ-ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রশস্ত পর্য্যায়। এই সময়ে ভাষাবিকাশের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতিই লক্ষ্য করা যায় না বটে, কিন্তু যেই হাঁটতে শেখা সম্পূর্ণ হয়, অমনি শব্দভাণ্ডারের এমন দ্রুত সমৃদ্ধি শুরু হয়ে যায় যে সবাই অবাক হয়ে যাই শিশুর কেরামতী দেখে! হাঁটতে শেখার পরবর্ত্তী পর্য্যায়ের এই সুযোগটা যদি

অভিভাবক ও শিক্ষকরা ঠিকমত কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে অনেক সহজে শিশুকে ভাষাবিকাশের পথে দ্রুত এগিয়ে দেওয়া যায়।

গোড়ার দিকে ছেলেরাই ভাষাবিকাশের পথে মেয়েদের চেয়ে একটু এগিয়ে চলে মনে হয়। কিন্তু বছর-দুই বয়সে যখন ছোট ছোট বাক্য-প্রয়োগ করবার সময় আসে, অর্থাৎ সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ ভাষার রাজ্যে শিশু উপস্থিত হয়, তখন থেকে মেয়েরা ছেলেদের ছাড়িয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। শিশুবিদ্‌রা বলেন, এর পিছনে মায়ের পক্ষপাতিত্বই আসলে দায়ী, কেননা তাঁরা এর কোন শরীরতত্ত্বমূলক কারণ খুঁজে পাননি। এই যুক্তিটা আরও জোরাল হয়, যখন দেখি 'একমাত্র ছেলে'র চেয়ে একমাত্র মেয়েরাই বিশেষ রকম বাক্‌পটু হয়ে থাকে!

বছর-দুয়েক বয়সে শিশু যখন সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ ভাষার রাজ্যে উপস্থিত হয়, তখন তার চিন্তাশক্তি ও যুক্তিবিদ্যার পরিশীলন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভাষার প্রধান যে কাজ ভাব-বিনিময়—এই পরিশীলন-স্তরে শিশু কিন্তু সে-বিষয়ে বেশী মন দেয় বলে মনে হয় না। তখন তার ভাষা হয় বেশির ভাগই আত্মকেন্দ্রিক।

একটি কথার বার-বার আবৃত্তি, নিজের সঙ্গেই প্রশ্নোত্তর খেলা —এসবই পাঁচ-বছর পর্য্যন্ত শিশুর আত্মকেন্দ্রিক ভাষার বৈশিষ্ট্য। এসবের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে তার উন্নততর শাব্দিক ভাষাকৌশল আয়ত্ত করতে যেমন বিশেষ অসুবিধে ঘটে, যুক্তিবিদ্যা ও চিন্তাশক্তির পরিপুষ্টি তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই পর্য্যায়ের পরেই বছর-৬।৭ বয়স থেকে পরিষ্কারভাবেই শিশুর ভাষা ক্রমশ সমাজায়িত হতে শুরু করে। এটা বেশ বোঝা যায় তার ছোটখাট সমালোচনা, আবদার, প্রশ্ন, উত্তর এবং তথ্যের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ লক্ষ্য করলে। শিশুর ভাষাবিকাশ-পথের এ যেন মোহানা!

স্বাভাবিক শিশু দেড় বছর বয়স নাগাদ কথা বলা শুরু করে। পরিবেশগত কারণে এটা একটু-আধটু দেরিতেও হতে পারে। তবে তিন-বছর বয়সেও ভাষা না ফুটলে শিশুকে ক্ষীণবুদ্ধি বলে সন্দেহ করা যেতে পারে।

যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে শিশুর প্রথম বয়সটুকু কাটে, ভাষাবিকাশে তার প্রভাব অপরিসীম। গরীব ঘরের শিশুরা স্বচ্ছন্দ কথাবার্ত্তার বিশেষ সুযোগ ও স্বাধীনতা পায় না। রকমারী বই, ছবি, জিনিসপত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে না বলে শব্দসম্পদ সমৃদ্ধিলাভ করতে যথেষ্ট দেরী হয়। অবশ্য দেখা গিয়েছে, একটু বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করলে ছোট শিশুর ভাষাবিকাশ

সহায়তা লাভ করে স্পষ্টই। আবার বাড়িতে বা স্কুলে দুটি ভাষার চলন থাকলে এর ঠিক উল্টোটাই ঘটে। শিক্ষাবিদ্‌রা এ-নিয়ে এখনও বিশেষ গবেষণা করছেন যে, অল্পবয়সের শিশুকে বিদেশী ভাষা শেখানোর ফলে তার ভাষাবিকাশ ও যুক্তিবিদ্যার যে বিশেষ ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়, তা কী করে রোধ করা সম্ভব।

যে সমস্ত শিশু একসঙ্গে জন্মায়, তাদের মধ্যে ভাষাবিকাশের স্পষ্ট ব্যাঘাত ঘটে, দেখা গিয়েছে। কারণ তারা পরস্পরের প্রতি একান্তই আকৃষ্ট থাকার ফলে সমাজায়িত হতে সময় নেয়। অনেকটা এই ধরনের কারণেই অনাথাশ্রম বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ছেলেবেলা থেকে লালিত-পালিত শিশুরাও ভাষাবিকাশে বেশ পিছিয়ে থাকে। সমাজ-গণ্ডীকে ছোট করে ফেললেই ভাষাবিকাশের ব্যাপক ক্ষতি। শিক্ষাবিদ্‌দের অনেকে এই জন্যেই নার্সারি স্কুলগুলিতে সুষ্ঠু ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারে আজকাল বিষেশ সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তোত্‌লামি ভাষাবিকাশের এক জবরদস্ত শত্রু। সাধারণত নিরাপত্তার অভাববোধ, স্নায়বিক পীড়ন এবং রুদ্ধ আবেগের ফলেই এর সৃষ্টি হয়। বাবা-মা বদ্‌রাগী হলে কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইবোনের আবির্ভাব হলে তোত্‌লামি একরকম অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম স্কুলজীবনেও অহেতুক ভীতির ফলে তোত্‌লামি আসতে পারে।

জোর করে বা তাড়াহুড়ো করে খাওয়ানোর ফলে শিশুর

স্বাভাবিক শ্বাস-ক্রিয়ার যে পীড়ন ঘটে, তার ফলেও ভাষাবিকলতা আসতে পারে। জন্মের আগে মায়ের কোনরকম শ্বাসরোগ, স্নায়ুদুর্ব্বলতা, কাশি, হাম প্রভৃতি হলে ভাবী শিশুর ভাষাবিকাশে বেশ দেরী হতে পারে।

এক শিশুবিদ্ বলেছেন, ভাষা হল আমাদের আবেগের থার্ম্মোমিটার। অতএব আবেগের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবমুক্তি ঘটাতে পারলে মানবশিশুর ভাষাবিকলতা কমবে অনেকখানি। এতক্ষণ শিশুর ভাষাবিকাশের শারীরবৃত্তীয় এবং মনোবৃত্তীয় সবদিকেরই পর্য্যালোচনা করে দেখা গেল, শিশু এবিষয়ে কতখানি অসহায়। শিশুকে এবিষয়ে সত্যিকারের সাহায্য করতে হলে শুধু আদর নয়, মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় তার প্রতি যত্ন ও মনোযোগ দেওয়াও প্রয়োজন।

মেধাবী শিশু

কথাবার্ত্তা-আচরণে করে তোলে মুগ্ধ, অথচ পড়াশুনা-কাজকর্ম্মে আপনাকে ক্রুদ্ধ করে দেয় যে শিশু, তাকে আপনি কী চোখে দেখবেন? একটি কারণে তাকে আপনি ভালবাসতে, আদর করতে উৎসুক—তার প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু আর একটি কারণে তার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন খুবই। আগ্রহ তার বহুমুখী, তার নানা প্রশ্নে আপনি ব্যতিব্যস্ত,—সান্ত্বনা পান এই ভেবে যে, ওর জ্ঞানলাভের কী আকুল স্পৃহা। আর স্কুল থেকে যখন চিঠি আসে—শ্রীমানের কামাইয়ের সংখ্যা বাড়ছে, তখন বড় ভাবনায় পড়েন নিশ্চয়ই।

শিশু মেধাবী হয়েও যদি এভাবে অশান্তির কারণ হয়, তাহলে সত্যিই আফ্‌শোষের কথা, পিতামাতা-শিক্ষক-

আত্মীয়স্বজনের পক্ষে তো বটেই, এমনকি জাতির পক্ষেও। মেধাবী শিশু যে আমাদের কোন সমস্যার কারণ হতে পারে, এধারণা আগে বড় একটা ছিল না। তাই এ ধরনের শিশুকে চোখের সামনে নষ্ট হতে দেখলে জাতীয় মনীষার কতখানি অপচয় হল, একথাও তাই আমরা আগে ভাবতে শিখিনি।

মেধা বা অসাধারণ বুদ্ধি নিয়ে যে শিশু জন্মায়, তার কেমন করে অপচয় হতে পারে, একথা ভাবতেই আশ্চর্য্য লাগে। 'অকালপক্ব' এক শ্রেণীর শিশুকে আমরা ঘৃণা করেই থাকি। এই ঘৃণার মধ্যে দিয়েই বুদ্ধিমান শিশুকে আমরা, বড়রা, অপচয়ের পথে ঠেলে দিই কি না, সে কথা ভাববার দিন এসেছে। বোকা যারা, পিছিয়ে-পড়া শিশু তারাই—এ কথা বিজ্ঞলোকেরা বলে থাকেন, এবং সেই অনুযায়ী অল্প বুদ্ধিমান শিশুদের প্রতি আমাদের যত্ন স্বভাবতই বেশী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তথাকথিত 'অকালপক্ব'দের পক্ষ থেকে এরকম যত্নের দাবি উঠতে পারে কি না?
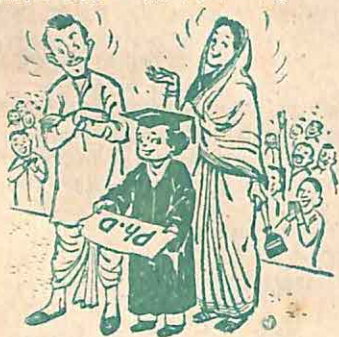
তা হলে একটু তদন্ত করা যাক। কার্ল উইটকে যখন চোদ্দ বছর বয়সে পি. এইচ-ডি উপাধি দেওয়া হল, অথবা যখন হরিনাথ দে বছর কুড়ি বয়সে চোদ্দটি ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন, তখন আপনার

মনে যে ভাব জাগবে, ভোম্বলের বাড়ি থেকে পালিয়ে টাটানগর যাত্রার কাহিনী শুনলে সেই মনোভাব জাগবে কি না ভেবে দেখুন ত একবার। মনোভাব যে অন্তত কিছুটাও বিভিন্ন হবে, সেটা আন্দাজ করা চলে। পুঁথির প্রতি টানের অনুপাতেই আমরা সচরাচর মেধাবী শিশুর নাড়ী বোঝবার চেষ্টা করি। তা হলে মানতে হয়, মেধাবী শিশুমাত্রই পড়াশুনায় খুব চটপটে হবে।

কথাটা যে-কোন বিচক্ষণ মাষ্টার মশাইকে বলে দেখুন, তিনি কিন্তু এটা মেনে নিতে একটু ইতস্তত করবেন। ভাল-মন্দ নানারকম ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে যাঁরা বহুদিন থেকে আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, সুদর্শন সুবুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের অনেকের মধ্যেই যতখানি কৃতিত্ব এবং পড়াশুনায় মনোযোগের পরিচয় আশা করা যায়, ততখানি পাওয়া যায় না। কতকগুলি কাজের মধ্যে দিয়ে আপনি এদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি গুণগুলির সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হলেন; কিন্তু অন্য কয়েকটি ব্যাপারে, বিশেষ করে পঠনপাঠনের ব্যাপারে, তার আশানুরূপ আগ্রহের অভাব দেখে যদি চিন্তিত হয়ে পড়েন, তা হলে আপনাকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না।

এই চিন্তার ফলে আপনি যদি সমস্যার উৎস-সন্ধানে উৎসাহী হন, তা হলে প্রথমেই যে সুস্পষ্ট কারণটি আবিষ্কার করবেন, সেটি হল মেধাবী শিশুর পড়াশুনা বা ঐ জাতীয়

কোন ভাবমূলক জ্ঞান অর্জ্জনে অসাধারণ দ্রুতগতি। কথাটা শুনে বোধ হয় খটকা লাগল। তা হলে একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মেধাবী শিশুর পাঠ্যবিষয় তার আয়ত্তে আসে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের চেয়ে অনেক আগেই এবং স্বভাবতই এই কারণে তার পিপাসু বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক দ্রুতগতিকে বাধ্য হয়ে ধীরমান করতে হয়। এর ফলেই আসে অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির শিথিলতা। অল্পসময়ে পড়া তৈরী করতে পারে, এই ধারণা তার মধ্যে আত্ম-গরিমার সৃষ্টি করলেও অস্বাভাবিক মনে করবার কারণ নেই। তখন কোন একটা পড়া জিজ্ঞেস করলে নিতান্ত সহজভাবে হেলায়-ফেলায় একটা মোটামুটি পাঠ শুনিয়ে দিয়েই আপনাকে খুশী করতে চাইবে। এইভাবে তার সুপ্রশংসিত মেধার কাছে সব-কিছুই নিতান্ত সহজ—এই সর্ব্বনাশা ধারণার বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং ধীরে ধীরে তার বুদ্ধিবৃত্তি-বিকাশের প্রকৃতিগত অসামান্য সহজ গতিক্ষেপে আসবে জড়তা, সমস্যা উঠবে ঘনিয়ে।

ছোট্ট খোকনের সদ্যঃ-বিকশমান মেধার পরিচয় পেয়ে সর্ব্বপ্রথম গর্ব্বে ভরে ওঠে মায়ের বুক। পাড়া-পড়শী, আত্মীয়স্বজন সকলের সামনেই সেই অপূর্ব্ব মেধা-বিকাশের বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে থাকেন তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে।

এই প্রশংসামণ্ডিত প্রদর্শন শিশুর, বিশেষ করে প্রকৃত মেধাবী শিশুর পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা মা-বাবারই সবপ্রথম ভাবা দরকার মনে করি।

আপনি বলবেন, শিশুর বুঝতে-শেখার বয়স এলে এ-ধরনের মুক্ত প্রশংসা ক্ষতিকর হলেও হতে পারে, কিন্তু মাত্র বছরখানেক বয়সে অতটা ভয়ের বোধ হয় কারণ নেই। তা হলে একটা কথা আপনাকে এখানে মনে করিয়ে দিতে হবে যে শিশুটিকে মেধাসম্পন্ন মনে করে নিয়েই তার প্রশংসা করা হচ্ছে এবং সে বছরখানেক বয়সে আপনার ভাষা বুঝতে না পারুক, তার সহজ মেধাসম্পন্ন গ্রহণশক্তির সাহায্যে ভাবভঙ্গীর মাধ্যমে ঐ অল্প-বয়সেও সে এটুকু বুঝতে পারে যে, তার প্রতি এক বিশেষ মূল্য আরোপ করা হচ্ছে।

প্রকৃত মেধাবী শিশুকে ঠিকভাবে চেনবার চেষ্টা করুন। কতকগুলো অদ্ভুত আচরণ, অস্বাভাবিক ভাববিকাশ দেখেই উল্লসিত হওয়ার আগে দেখবেন, যে বিষয়ে তার আগ্রহ সেদিকে তার আকুলতা কতখানি। প্রকৃত মেধাবী শিশুর হাতে খেলনার রেলগাড়িটা পড়লে সে তার চাকা, পিষ্টন, ক্ষুদে জানলা, হেডলাইট, এমনকি গাড়ির নকল নম্বরটা সম্পর্কেও নিখুঁত আগ্রহ প্রকাশ করবে। অদম্য কৌতূহল, প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং তার উপযুক্ত স্মারণ, যথেষ্ট শব্দসম্পদ সংগ্রহ, সংখ্যার প্রতি আকর্ষণ—এসবের দ্বারাও আপনি মেধাবী শিশুকে চিনে নিতে পারেন।

আবার দেখবেন, তার 'হবি'র সংখ্যাও বড় কম নয়। কাগজ-কাটা থেকে আরম্ভ করে ফোটোগ্রাফী পর্য্যন্ত হরেকরকম খেয়ালখুশির খেলায় সে মেতে থাকে; কোন একটি মাত্র 'হবি' নিয়ে সে সাধারণত সন্তুষ্ট নয়। এ হল মেধাবী ছেলে-মেয়েদের বহুমুখী অনুরাগের শুভলক্ষণ। সাধারণত শিশুদের মনোযোগের স্থিতিকাল খুবই অল্প; কিন্তু মেধাবী শিশু যে বিষয়ে অনুরক্ত হয়, তাতে একটানা তিন-চার ঘণ্টা পর্য্যন্তও লেগে থাকতে পারে। সাধারণ শিশুর অনুরাগ এতখানি স্থিতিসম্পন্ন কখনই হতে পারে না।

অনেকে মনে করেন, ছেলেমেয়েদের মেধা থাকলে শরীর হয় খারাপ। একথা কিন্তু ঠিক নয়, মেধাবী শিশুদের স্বাস্থ্য ভালই থাকে। তারা যমজ হলে স্বাস্থ্য খুবই চমৎকার হয় বলে শিশুবিদ্‌দের মত। তারা সাত থেকে চোদ্দ মাসের মধ্যেই হাঁটতে শিখে যায়, আঠারো মাসের মধ্যেই কথা বলতে পারে, আর চার বছর বয়সেই বই পড়বার ক্ষমতা লাভ করে ফেলে। এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মেধাবী শিশুর এসমস্ত বৈশিষ্ট্যই সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হতে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারে; খুব ধনী বা খুব গরিব ঘরে মেধাবী

শিশুর দেখা মেলা ভার। মেধাবী শিশুর ঘরের কথা যখন উঠল, তখন বলে রাখি, যে ঘরে পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে সকলের আছে দায়িত্বজ্ঞান,—মেধাবী শিশুর বিকাশের পক্ষে সেই ঘরের পরিবেশ বিশেষ উপযোগী। বাবা-মায়ের আগ্রহ হবে বহুমুখী এবং কিছু-না-কিছু স্বাস্থ্যকর 'হবি' থাকবেই। আর তাঁদের স্বাস্থ্য হবে সুন্দর। পরিবারটি হবে ছোট।

মেধাবী শিশুকে চেনবার মাত্র কয়েকটি সাধারণ সূত্র নিয়ে একটু আলোচনা করা গেল। এর কোন একটি মাত্র সূত্রকে অবলম্বন করে যাচাই করতে গেলে ঠকতে হবে। কেউ কেউ এমনও বলেন, তিন বছরের আগে শিশুর মানসিক শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা এভাবে কোনমতেই সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

আগেই বলেছি, অসাধারণ মেধাবী শিশুর মধ্যে ধর্ম্ম, দর্শন এইসব ভাবমূলক চিন্তার গতি হয় দ্রুত। এর ফলে সমবয়সী সাধারণ বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না। অসামান্য মেধাবী শিশু নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই চেষ্টা করবে দলের খেলাধুলা, কাজকর্ম্মের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আনতে এবং স্বভাবতই সেই পরিবর্ত্তনগুলি হবে কিছুটা জটিল এবং উচ্চস্তরের। সাধারণ ছেলেমেয়েরা এ সব ব্যাপারে আকৃষ্ট হতে পারে না এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান শিশু এই কারণেই নেতৃত্ব পদ হারাতে বাধ্য হয়।

নেতৃত্ব হারিয়ে সে যে অন্য কোন অল্প-বুদ্ধিমান শিশুর নেতৃত্ব মেনে নেবে, সেখানেও একটি জিনিষ তাকে বাধা দেবে, সেটিকে আমরা উচ্চমন্যতা না বললেও স্বাভাবিক আত্মোৎকর্ষ-বোধ বলতে পারি স্বচ্ছন্দে। এই বোধটুকুর ফলে সে একটা বিচ্ছিন্ন সত্তা লাভ করে 'একঘরে' হয়ে পড়বে। বুঝতেই পারছেন, এই বিচ্ছিন্নতার জন্যেই তার সমাজ-চেতনা জাগতে হবে দেরী, হয়ে পড়বে আত্মকেন্দ্রিক এবং সৃষ্টি হতে পারে আরো অনেক জটিলতা।

মেধাবী শিশু যে সবক্ষেত্রেই শান্তশিষ্ট আদর্শ হবে, এমন ধারণা থাকলে ত্যাগ করুন। তার অসাধারণ মেধার জন্যেই সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে পারে, কেমন করে, তা এখুনি বলেছি। আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মোৎকর্ষবোধ—এ দুটি থেকেই আবার জাগতে পারে ঈর্ষাবোধ, তা থেকে আক্রমণ-প্রবণতা, খিট্‌খিটেভাব আর একগুঁয়েমীর মত দোষগুলিও মাথাচাড়া দিতে কতক্ষণ!

আপনাকে যদি বলি, মেধাবী ছেলেরাও স্কুল পালিয়ে বেড়ায়, তা হলে হয়ত বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। শিশু যখন দেখবে এবং বুঝবে যে, সে ক্লাসের অন্য সকলের চেয়ে যথেষ্ট

চটপট কাজ করে, তখন তার মনে আসবে শিথিলতা। তার অসাধারণ মেধার উপযোগী খোরাক যখন স্কুলের ক্লাসে পায় না, উপরন্তু যদি তার অসামান্য মেধার ফলে নেতৃত্বটুকুও হারাতে হয়, তখন কিসের আকর্ষণে সে ক্লাসে বসে থাকতে পারে, বলুন ?

ঠিক এই কারণেই বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী স্কুলের দেওয়া বাড়ির কাজ মোটেই করে না, অর্থাৎ করবার দরকারই মনে করে না, যেহেতু ও-সবই তার কাছে নিতান্তই সহজ। প্রশংসার ধাক্কায় অতিরিক্ত চটপট অঙ্ক কষতে গিয়ে প্রায়ই ভুল করে নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। হাতের লেখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যত্নের অভাব দেখা যায়। তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে নতুন নতুন অসৎ উপায় অবলম্বন করে আমাদের বিরক্ত করে।

এইভাবে সে আমাদের কাছে হয়ে পড়ে সবজান্তা, ফাঁকিবাজ। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোন মাপজোক করে উঠতে পারি না আমরা ; তাই ছোটখাট কাজে তার অবহেলা দেখে তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অপবাদ দিই। বড়দের বই ছোটদের পড়তে দেখে বলি 'অকালপক্ব'। এগার বছরের একটি প্রকৃত মেধাবী ছেলে যদি রবীন্দ্রনাথের উঁচুদরের কবিতা পড়তে ভালবাসে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক পাঠে মগ্ন হয়ে পড়ে এবং তার মধ্যেই তার অসাধারণ চিন্তাক্ষমতার খোরাক খুঁজে পায়, তবে বাধা দেবার কী বিশেষ কারণ আছে, তা ভেবে দেখি না।

এ ধরনের ছেলেমেয়েদের আন্তর-শক্তির যথাযথ পরিচয় পাওয়ার এবং তার পরিপোষণের চেষ্টা না করে আমরা যদি বাধার পরে বাধা স্বষ্টি করি তার অসামান্য গতিপথে, তবে তার প্রেরণা হয়ে পড়বে পঙ্গু। সহানুভূতির অভাবে চারিপাশের সকলের ওপরই সে হয়ে উঠতে পারে বিরূপ। তখন আমরা তাকে বলব 'বেয়াড়া' ছেলে।

সাধারণত মেধাবী শিশুর মায়েরাও বিশেষ বুদ্ধিমতী কিন্তু অসামান্য আবেগের অধিকারিণী হয়ে থাকেন! ফলে তাঁরাই আবার তাঁদের শিশুকে আরো জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেন। কখনো অতিরিক্ত যত্ন, আবার কখনো একটা দোষত্রুটির ফলে সন্তানকে এমনভাবে 'দূরছাই' করে সরিয়ে দেন যে, সে-আচরণ শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করে দিয়ে যায়।

আট বছরের একটি মেধাবী শিশুর মা তাকে জামা-পরান, চান-করান, খাওয়ান—সবই করে দিতেন। ঐ বয়সে শিশুরা এগুলি অনায়াসেই করতে পারে ; কিন্তু আপত্তি করলেই তিনি বলতেন, 'ও যাতে লেখাপড়া ভাবনাচিন্তার দিকে মন দিতে পারে, সেজন্য এগুলো করে দেওয়াই উচিত।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেধাসম্পন্ন শিশুরা তাদের ঘরের ব্যক্তিগত কাজের ভার অন্যান্য শিশুদের চেয়ে অনেক আগেই শিখে নিতে পারে এবং তার মধ্যে দিয়েই তাদের বহুমূল্য দায়িত্বজ্ঞানের প্রথম দীক্ষা হয়ে যায়। অভিভাবকের অতি-যত্ন এই দায়িত্বজ্ঞানের কতখানি সর্ব্বনাশ করে, সে কথা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না।

যে শিশু মেধাসম্পন্ন অথচ অসামাজিক, সে অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিমান শিশুর কাজেও কোন কোন সময়ে হার মানতে পারে। এজন্য মেধাবী শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাকে সমাজায়িত করে তোলা অভিভাবকদের এক গুরুদায়িত্ব, এ কথা মনে রাখতে হবে। দৈনিক দু-এক ঘণ্টা করে দল বেঁধে স্বাধীনভাবে খেলাধূলা করবার সবরকম সুযোগ এবং উৎসাহ তাকে দিতেই হবে। খেলার প্রতি আকর্ষণ কমতে দেখলে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকবে। এ ছাড়া বাবা-মাকে শিশুর সঙ্গে প্রয়োজনমত আলাপ-আলোচনার ফুরসুত রাখতে হবে। মেধাবী শিশুর চিন্তাক্ষমতা বিশেষ শক্তিশালী থাকে বলে তাদের পক্ষে সহজেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়া স্বাভাবিক। এ জন্যে পরিবেশের প্রতি তার আগ্রহকে সদাস্ফূর্ত্ত রাখবার প্রাথমিক দায়িত্ব নিতে হবে মা ও বাবাকে।

এই আগ্রহ যদি তীব্রতর করতে হয়, তাহলে তার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ও যত্নবান হতে হবে। মেধাবী শিশু যে শুধু প্রচুর প্রশ্ন করে, তা নয়। সেগুলি হয় বুদ্ধিমানের মতই ভাবিয়ে-তোলা প্রশ্ন এবং বার বার একই প্রশ্ন করে চলে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া অবধি। এ সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেওয়ার জন্যে বড়দের বেশ ভাবতে ও খাটতে হয়। বোকা বনে যাবার ভয়ে ধমক মেরে থামিয়ে দেওয়া কিংবা চট্ করে যা-হোক একটা-কিছু

জবাব দেওয়ার মত মারাত্মক কাজ বোধ হয় আর-কিছু হতে পারে না।

জবাব যদি না জানেন, তা হলে শিশুকে হদিস দিয়ে দিন কোথায় কেমন করে জবাব পাওয়া যাবে ; এবং আপনি নিজেও তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে লেগে যান জবাব খোঁজার অভিযানে। এতে লজ্জার কিছু আছে, এমন কথা ভুলেও ভাববেন না। বরং এ কথাটা আপনি নিজেই কদিন পরে বুঝতে পারবেন যে, সিলেবাস ধরে স্কুলে পড়ানোর চেয়ে এর দাম হাজারোগুণ বেশী।

যত্ন এবং পথপ্রদর্শন একান্ত দরকার শিশুর মেধাকে যথোচিতভাবে বিকশিত করতে হলে, এটা না হয় বোঝা গেল। তবে বুদ্ধিমান শিশুর মা-বাবা যদি সন্তানের জ্ঞানের

পরিধি হু হু করে বাড়িয়ে তোলবার সদিচ্ছায় মানুষের দেহের সব ক'টি হাড়ের নাম তাকে মুখস্থ করাতে লেগে যান, অথবা ধরুন, তার নৃত্য, সঙ্গীত বা নাট্যপ্রতিভা বিকাশে উপযুক্ত উৎসাহ দেওয়ার খাতিরে কেবলই রঙ্গমঞ্চে বা রূপোলী পর্দায় হাজির করবার সুযোগ খোঁজেন, তাহলে নিতান্তই অন্যায় হবে।.... শিশুর বিকাশ হবে

স্বাভাবিক, সে তার ছেলেবেলার বৈশিষ্ট্যগুলো যেন হারিয়ে না ফেলে বড়দের অতিরিক্ত যত্নের চাপে, সেদিকে নিশ্চয়ই খেয়াল রাখতে হবে।

বাড়িতে আপনি না হয় শিশুর মেধাকে ঠিকমত বুঝতে পেরে ব্যক্তিগত খোরাক জোগানোর ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু স্কুলে এতখানি ব্যক্তিগত যত্ন ত সম্ভব নয়। শিক্ষাবিদেরা এজন্যে খুবই ভাবছেন। কেউ কেউ বলেন, মেধাবী শিশুর অগ্রগতি ব্যাহত হবে না, যদি তাকে ডবল প্রমোশন দেওয়ার
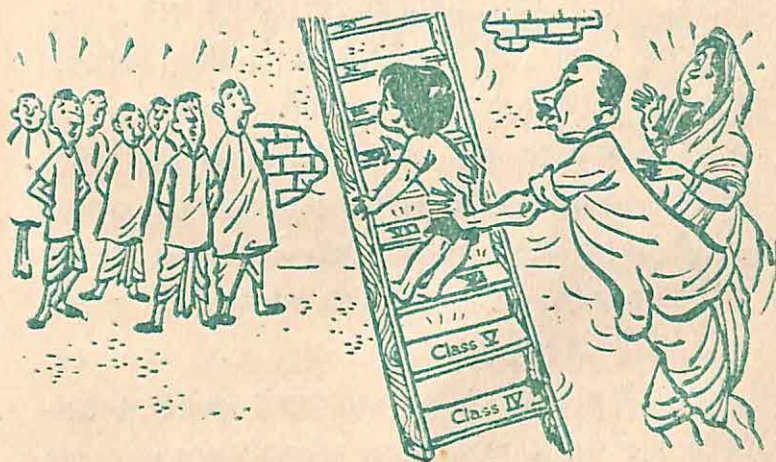
সুযোগ রাখা হয়। অপর একদল শিক্ষাবিদ্ বলছেন, ডবল প্রমোশন মেধাবী শিশুর মধ্যে মারাত্মক উচ্চমন্যতার সৃষ্টি করে, তার সমাজচেতনার বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে গ্রন্থকীট হয়ে পড়ে। অতএব এদের পৃথক সেক্‌শন করে

বিশেষ ধরনের উন্নত পাঠ-প্রস্তুতির ব্যবস্থা রাখা উচিত। এদের জন্যে বার্ষিক বা কোন নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ের পাঠক্রম নির্দ্ধারণ না করে চুক্তি অনুসারে পড়ান উচিত। এই চুক্তি হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে।

একটা বিষয়ে অবশ্য সকলেই একমত হয়েছেন যে, মেধাবী শিশুর স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলি বহুবিধ এবং বহুমুখী হওয়া বিশেষ দরকার। এতে করে তার প্রতিভা সত্যিকারের আলো খুঁজে নেওয়ার স্থযোগ পায়। অসামান্য বুদ্ধির সাহায্যে তার প্রতিভা উপযুক্ত পথে যথোচিতভাবে বিকশিত হবে আপন শক্তিতেই, এতটা আশা করা উচিত নয়। প্রতিভা বিকাশের জন্যে শুধু তাকে কতকগুলি স্থযোগ-স্থবিধা আর স্বাধীনতা দিলেই কাজ ফুরবে না; এসব সত্বেও লাগবে সদাজাগ্রত স্থচিন্তিত পথপ্রদর্শন—পথ দেখিয়া নিয়ে যাওয়ার লোক। মেধাবী শিশুর আগ্রহ বহুমুখী বলেই এই সতর্কতা এবং এই সতর্কতার অভাবে কত শিশু বহুমুখী আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলেছে।

প্রতিটি ঘরে প্রতিটি স্কুলে অল্পবয়সেই মেধাবী শিশুকে খুঁজে বার করবার জন্যে আমরা যদি সজাগ হতে পারি, এবং পূর্ণ গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলি, তাহলে সর্ব্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির পথে তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ বর্ত্তিবাহী হয়ে দাঁড়াবে।

খেলায় কাটে বেলা...

গরমের ছুটিতে রোজ সকালবেলা টুনু উঠে যেত ছাদের নিরালা ছোট্ট ঘরটিতে, অঙ্কের বই আর খাতা বগলে নিয়ে। একদিন ধরা পড়ে গেল, ঐ নিরালা ঘরটি টুনুচন্দ্রের সাধের সাধনা ঘুড়ি-মাঞ্জার একটি কারখানা বিশেষ! অঙ্ক যেটা হয়, সেটা কেবল ঘুড়ির মাপজোক নিয়েই। এত বড় একটা আবিষ্কারের পর ওর দাদা-কাকারা উত্তম-মধ্যম পুরস্কারের বিশেষ আয়োজন করলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

এমন একদিন ছিল, যখন খেলা জিনিষটাকে নিতান্তই সময়ের অপব্যয় বলে পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করতেন। বর্ত্তমানে অবশ্য অতখানি গোঁড়ামি না থাকলেও আজও দাদা-কাকারা ছোটদের খেলাকে 'রেশন' করে মেপে দিতে চেষ্টা করে থাকেন।

এত বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও কাজের ফাঁকে পড়ার আড়ালে খেলার প্রতি শিশুর এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা, এই গভীর আগ্রহ কেমন করে নব-নবীন থাকে, জানতে ইচ্ছে হয়। বড়দের শতসহস্র বিধিনিষেধ অতিক্রম করে খেলার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার এই শক্তি-প্রবণতা সামান্য শিশু পায় কোথা থেকে, এ-বড় রহস্য বটে।

আপনি বলবেন, এটার মধ্যে আবার রহস্য কোথায় আছে? ছোট ছেলেমেয়েরা জানেনা এ-সংসার কত জটিল, জানেনা লেখাপড়া-কাজকর্ম্ম না শিখলে জীবনে কত দুঃখ আসে; তাই হেলায়-খেলায় জীবনটা কাটাতে চায় তারা।....এবার তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করা যাক্।—আপনি তো শৈশব কাটিয়ে বড় হয়েছেন, এ সংসারে লেখাপড়া-কাজকর্ম্মের
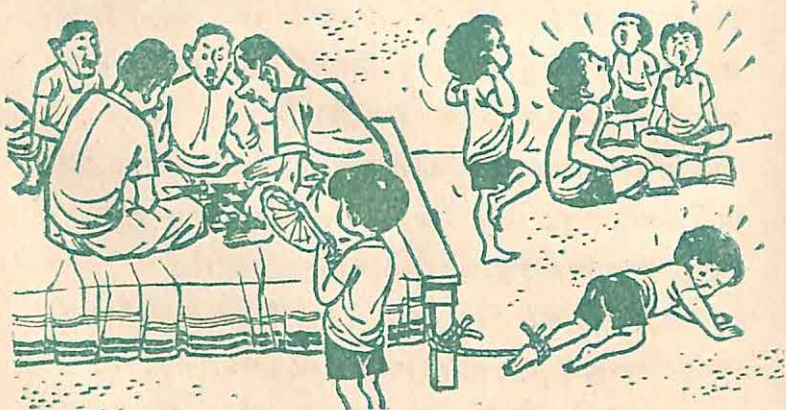
উপযোগিতা আপনি বেশ ভালই বোঝেন; তবুও আপনি

কেন তাসদাবা, ফুটবলের মাঠ, মাছধরার ছিপ, এসব নিয়ে মাঝে মাঝে খুব মেতে ওঠেন ?

মানুষের খেলার প্রবৃত্তি সম্পর্কে যে সব মনোবিদ্ চিন্তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, দৈনিক প্রয়োজনীয় কাজের রকমারী তাগিদের বোঝা থেকে মানুষ সাময়িকভাবে মুক্তি পায় খেলার মাধ্যমে। কাজের নীরসতার মধ্যে খেলা এনে দেয় একটা স্নিগ্ধতা।

এই মতবাদ অনুসারে আপনার ক্রীড়াপ্রবৃত্তির না হয় একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা করা গেল, কিন্তু শিশুর খেলার কৈফিয়তে এ মতবাদ অচল। শিশুর বেলায় দেখছি, তার জেগে থাকা প্রায় সব সময়টুকুই অধিকার করে আছে খেলা ; কাজ বলতে বড়রা যা বুঝি, সেটা সে জানেও না, করেও না।

এখানে এগিয়ে এসেছেন ব্যূহ্লার সাহেব। শিশুর খেলার প্রবৃত্তির একটা বিকাশ আছে, একথা তিনি বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। জন্মের পর মাস তিনেক পর্য্যন্ত সুস্থ শিশু কেবল হাত-পা নাড়ে, অল্প হাসে—বিশেষ করে খাওয়ার পরে এবং ঘুমের আগে। তিন মাসের পর ছোট খাট জিনিষ হাতে ধরে নাড়তে, ঠুকতে চায়। মাস দশেক হলে অকারণে জিনিষপত্র ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দ পায়। দুহাতে দুটি জিনিষ দিলে ঠোকাঠুকি করে। মুখে নানারকম শব্দের সৃষ্টি করেও তাকে খেলা করতে দেখা যায়। রবারের পুতুল হাতে পেলে তাকে টেপে এবং প্যাঁক্ শব্দটা বারে বারে শুনতে চায়। ব্যূহ্লার-এর মতে

এটা হল শিশুর ক্রীড়া প্রবৃত্তি বিকাশের কার্ম্মিক পর্য্যায়। এই পর্য্যায়ে শিশু তার সংবেদনশীলতা ও চেষ্টা-ক্ষমতা নিয়ে স্বাধীন ও স-হজ ভাবে সাধনা চালিয়ে যায়। তিনি বলেছেন, এটা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ।

কার্ম্মিক পর্য্যায়ের পর শিশু প্রতিরূপাত্মক খেলার দিকে মন দেয়। এই সময়ে মনগড়া বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠে তার খেলার কাঠামো। বছর খানেক বয়স থেকেই এই পর্য্যায়ের সূচনা হয় বলা চলে এবং বিকশিত হতে থাকে ১২।১৪ বছর পর্য্যন্ত। এই সময়টি শিশুর ক্রীড়াপ্রবৃত্তি বিকাশের পক্ষে যেমন গুরুত্বপূর্ণ; তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। কারণ এই পর্য্যায়ে তার মনে কল্পনার মহিমময় শক্তির শুভ-জাগরণ সুরু হয়।

প্রতিরূপাত্মক পর্য্যায়ের প্রথম দিকটায় ছোটখাট কাজের অনুকরণ প্রবৃত্তি, বারে বারে সেই কাজটি করার মধ্যেই শিশু তার খেলার খোরাক জুটিয়ে নেয়। কিন্তু যতই দিন যায়, ততই দেখা যায়, শিশুর খেলার মধ্যে একটা মুক্ত-চঞ্চল কল্পনার ছোঁয়াচ লাগছে। নিজেকে সে বাস-ড্রাইভার মনে করে গাড়ি হাঁকাচ্ছে বিনা গাড়িতেই, আবার গিন্নী সেজে কাঠের পুতুলকে ধরে বেদম ঠেঙাচ্ছে। এই ধরনের মনগড়া বিশ্বাসের খেলা ৩।৪ বছর বয়সে যেন শিশুকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বলেছি, শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে এই

পর্য্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই যে মনগড়া বিশ্বাসের খেলা, এটা হল শিশুর মনের মুকুর। সে যা ভাবছে, চাইছে, শিখছে, সবকিছুরই প্রতিরূপাত্মক অভিপ্রকাশ ঘটছে এই সব খেলারই মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে পরিশীলিত হচ্ছে তার কল্পনাশক্তি, যা তার চিন্তা-পথকে করে তোলে সুগম। কোন কোন শিশুবিদ্ বলেছেন, এই পর্য্যায়ের খেলা হল শিশুর স্বাভাবিক ভাষা। কথাটা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্ভবত এই কথাটারই বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে ফ্রয়েডের পরিসমন্বয়ন মতবাদে। তিনি বলেছেন, বহির্জগতের সঙ্গে শিশু সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটাচ্ছে এই খেলার মধ্য দিয়েই এবং এই পথেই সে সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার চেষ্টা করছে আর নানারকম আচরণের প্রকাশ ঘটিয়ে সমাজের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন অভিজ্ঞতার পথে পা বাড়াচ্ছে। বড়দের খেলার ব্যাপারেও এই মতবাদ অনেকটা আলোকদান করে, একথা আপনাকে মানতেই হবে।

পরবর্ত্তী পর্য্যায়টি গঠনাত্মক এই সময়ে শিশুর ক্রীড়াপ্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং অনেকটা বড়দের মতই সে খেলার মধ্যে কাজ ও কাজের মধ্যে খেলাকে খুঁজে পায়।

বছর দশেক বয়সে শিশুর মধ্যে গঠনাত্মক খেলার কিছু আগ্রহ দেখা গেলেও এই পর্য্যায়ের স্বাভাবিক সূচনা হয় ১৪।১৫ বছর বয়সে। খেলার মধ্যে দিয়ে কোন জিনিষ সৃষ্টি করা যায়, এ-ধারণা এই বয়সের আগে তেমন হয় না। শিশুর মধ্যে

সৃজনমূলক সচেতনতা জাগাবার পক্ষে এই পর্য্যায়টি তার খুবই সহায়তা করতে পারে, যদি উপযুক্ত সহানুভূতি ও সহযোগিতা দেওয়া যায়।

এতক্ষণ শিশুর ক্রীড়া-প্রবৃত্তি বিকাশের সুস্পষ্ট তিনটি পর্য্যায় নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা গেল। লক্ষ্য করে দেখবেন, বৃহ্লার যেভাবে এই তিনটি পর্য্যায়ের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, তা থেকে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, শিশু নিজেকে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরী করবার উদ্দেশ্যেই খেলার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য এই উদ্দেশ্যমূলক এগিয়ে চলাটা শিশুর ইচ্ছামত হচ্ছে না—এটা নিতান্তই সহ-জ।

এই প্রস্তুতি-মতবাদটিকে আরও সুন্দরভাবে সমর্থন করেছিলেন বিখ্যাত জ্ঞানী-মনোবি কার্ল গ্রুস। একেই আবার অন্যভাবে সহ-জ মতবাদের ভিত্তিতে খাড়া করবার

চেষ্টা করেছিলেন ম্যাক্‌ডুগ্যাল। আজকাল অবশ্য সহ-জ মতবাদের মূল্য অনেক কমে গেছে, তাই ডিউই সাহেবের একটি মতবাদ বর্ত্তমানে এ বিষয়ে সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, মানুষ যে জীব-কোষের সমষ্টি, তার মধ্যে একাধিক আন্তঃ-জৈব উদ্দীপনা সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল রয়েছে, এ কথাটা জীববিদ্যাসম্মত। এই যে আন্তঃ-জৈব উদ্দীপনা, অর্থাৎ জীবকোষগুলির পরস্পরের মধ্যে সদাস্ফূর্ত্ত আকর্ষণ-বিকর্ষণ, এর ফলে জীবনের সবটুকু জুড়েই দেখতে পাই কর্ম্মচাঞ্চল্য। খেলা হল সেই স্বাভাবিক জৈব কর্ম্মচাঞ্চল্যেরই স্বাধীন রূপ।

এইসব মতবাদের আলোচনার পর এখন যদি আপনাকে বলি যে, মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরা যে-সমস্ত স্তরের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার পথে এগিয়েছেন, শিশুর খেলার মধ্যে আমরা তারই একটা সংক্ষিপ্ত পরিবৃত্তি দেখতে পাই,—তাহলে আপনি নিশ্চয়ই মানতে চাইবেন না। ষ্টান্‌লী হলের এই মতবাদ কিন্তু একসময়ে খুব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আদিম মানুষ তার অঙ্কুর-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালন ও পরিশীলন করতে করতে যে-সমস্ত পর্য্যায়ের মধ্যে দিয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, কোনরকম শিক্ষা বা অনুকরণ ছাড়াই শিশুর খেলার মধ্যে নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে হলেও সেই পর্য্যায়গুলির যেন একটা পারম্পরিক পরিবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। ছ'বছরের একটি শিশুকে দেখি মাটি অথবা বালির মধ্যে গুহা তৈরির

অদ্ভুত খেলা খেলতে; আবার ন-দশ বছর হলে তীর-ধনুক
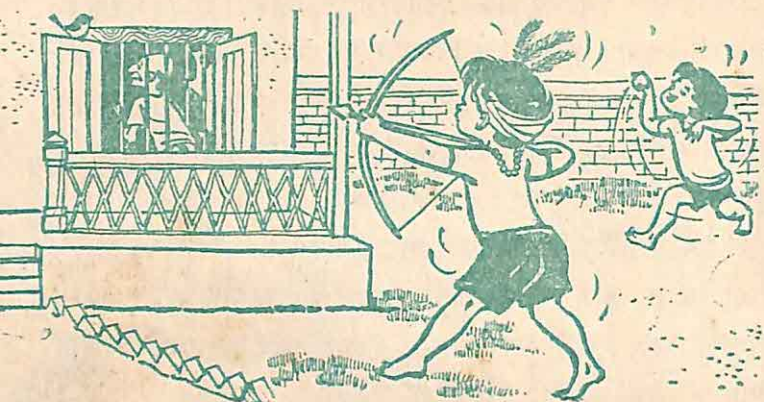
ঢিল-পাটকেল ছোঁড়বার একটা অদম্য প্রেরণা তারই মধ্যে কোথা থেকে যে জেগে ওঠে, বোঝা যায় না। সম্ভবত এরই জন্যে শিশুর প্রথম বয়সে খেলার মধ্যে থাকে খেলনা নিয়ে টানাটানি-খাম্‌চাখাম্‌চি করবার একটা আদিম প্রবৃত্তি। পরে ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক ও সমাজায়িত হয়ে ওঠে।

বহুদিনের আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণার পর অবশ্য খেলার এই পরিবৃত্তিবাদ আজকাল একেবারেই বাতিল হয়েছে, কারণ সবরকম খেলার কৈফিয়ত দিতে এ-মতবাদ সফল হয়নি। বহু প্রাচীনকালে একদল ক্রীড়াবিদ্ বলতেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখন অতিরিক্ত প্রাণশক্তি পুঞ্জীভূত হয়, তখন তাকে মুক্তি দেবার জন্যেই তারা খেলে। কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের খেলায় মগ্ন হয়ে পড়ে কেন,

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বলে এ-মতবাদটিও বহুদিন আগে বাতিল করতে হয়েছে।

প্যাট্রিক নামে এক ভদ্রলোক একবার বলেছিলেন, আমরা মস্তিষ্কের কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শারীরিক কাজ করে একটা সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা করি এবং ক্লান্তিটাকে এইভাবে প্রমোদিত করার নামই খেলা। শারীরিক কাজে ক্লান্ত হলে ঠিক এই কারণেই মস্তিষ্কের কাজ করে আমরা প্রমোদিত হই। এই প্রমোদন-মতবাদ অবশ্য বোঝাতে পারেনি যে, শিশুরা যখন একটি শারীরিক খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন অন্য একটি নতুন ধরনের শারীরিক খেলা পেয়ে আবার নবোদ্যমে খেলতে শুরু করে দেয় কেন।

আমাদের এই আলোচনার গোড়াতে একটা কথা উঠেছিল যে, অবুঝ শিশুরা জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝতে না পেরে নিতান্তই হেলায়-খেলায় সময় কাটায়। এতক্ষণ নতুন-পুরনো-গ্রাহ্য-বাতিল নানারকম মতবাদ পর্য্যালোচনা করে আমরা একটা সহজ সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই হাজির হতে পেরেছি যে, শিশুর খেলাগুলি বাজে কাজ ত কোনমতেই নয়, বরং বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে যে, আমাদের আজকের পরিপূর্ণ মানবতার জন্যে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের শৈশবের খেলার জীবনকে ধন্যবাদ দিতে পারি।

আসুন তাহলে শিশুকে খেলতে দেখলে 'কেবল ফাঁকি' বলে তেড়ে না গিয়ে আমরা ভেবে দেখি কেমন করে শিশুর

জীবনকে সহজ-স্বচ্ছন্দ-স্বাধীন খেলার আবহাওয়ায় ভরিয়ে রেখেও তাকে পরিপূর্ণ মানবতার পথে এগিয়ে দেওয়া যায়।

খেলার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন বলেছেন, আমরা যা করতে চাই সেটা স্বাধীনভাবে করতে পেলেই খেলা হল। ধরুন, আপনি ছবি আঁকতে চান এবং ছবি আঁকার সবরকম স্বাধীনতা ও সুযোগ পেলেন, তাহলে ছবি আঁকাটা আপনার কাছে হয়ে দাঁড়াল অতি প্রীতিপদ একটি খেলা। অথচ এই খেলার মাধ্যমেই গড়ে উঠল আপনার জীবনের পেশা,—কতজনের তাগিদে অবিশ্রান্তভাবে হরেকরকম ছবি আর নক্সা এঁকে চলেছেন, কিন্তু সবই খেলার ছন্দে, মনের আনন্দে। কাজ আর খেলা এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে।

বড়দের মাপকাঠিতে শিশুর যে-সব কাজ করা উচিৎ বলে মনে করা হয়, সেগুলির সঙ্গে খেলার এমন একাত্মতা ঘটান সম্ভব হয়েছে বলেই আধুনিকতম শিক্ষাক্ষেত্রে খেলার এত মানমর্য্যাদা। তবে মনে রাখতে হবে, খেলার তিনটি অতিপ্রয়োজনীয় লক্ষণ যেন বজায় থাকে,—খেলা হবে আনন্দদায়ক, এতে থাকবে স্বাধীনতার স্ফূর্তি, আর থাকা চাই তীব্র আন্তর-প্রেরণা।

সঙ্ঘসমিতি-স্কুলে অনেক সময়ে দলবদ্ধভাবে শিশুদের খেলার ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই অতি-প্রয়োজনীয় আন্তর-প্রেরণার দিকে মন দেওয়া হয়ে ওঠে না। কারণ সেখানে

খেলার সময়ে খেলতে হবে, এই ডিসিপ্লিন বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে শিশুকে বেঁধে ফেলা হয়। এভাবে যদি বাধ্যবাধকতা দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তি ব্যাহত হয়, তাহলে খেলার শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য প্রায় ব্যর্থ হল বলা চলে।

এজন্যে দলবদ্ধ খেলায় শিশুকে রাখবার দরকার যখন হবে, তখন পরিচালককে হতে হবে বিশেষ সতর্ক। দলটিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, এমন মনোভাব না রেখে সহযোগিতার মনোভাব রাখাই একান্ত প্রয়োজন। শিশুরাই খেলবে, পরিচালক হবেন দর্শকমাত্র, প্রয়োজন হলে দেবেন সহায়তা। এতে শিশুদের মধ্যে একতা ও আত্মনির্ভরশীলতা জাগবার সুযোগ থাকে। 'এটা করো, ওটা করো, ওঠো বসো, রকমারী নির্দ্দেশের ধাক্কায় শিশুদলকে খেলার মাঠে মাতিয়ে রাখা যায়
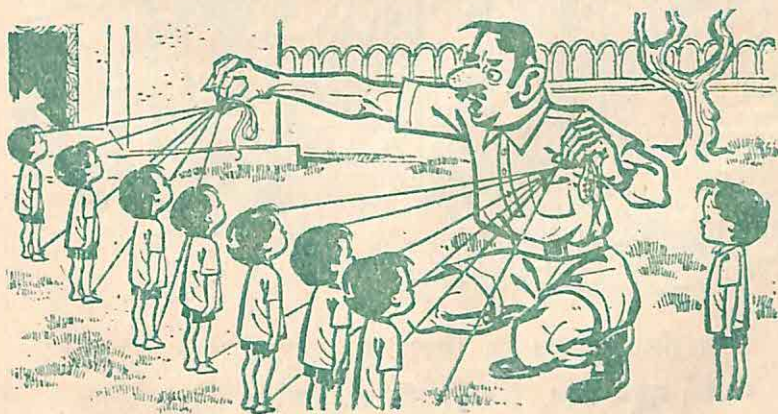
এবং তাতে পরিচালকের ব্যক্তিত্ব প্রশংসা পাবার যোগ্য হয়ে

বটে, তবে শিশুদের মানসিক বিকাশ অনিবার্য্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই বলি, শিশুকে খেলতে দিন মুক্তির আনন্দে। দেখবেন, এর মধ্যে দিয়েই সে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই সমান তালে বিকশিত হয়ে উঠছে এবং এগুলিই সহায়তা করছে তার ব্যক্তিত্ববিকাশ ও শিক্ষাঅর্জ্জনে।

যথেষ্ট পরিমাণ খেলার সুযোগ পেলে শিশু রোগ আর দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে চলবার স্বাভাবিক শক্তি অর্জ্জন করতে পারে আর রোগে পড়লেও সেরে উঠতে দেরি লাগে না।
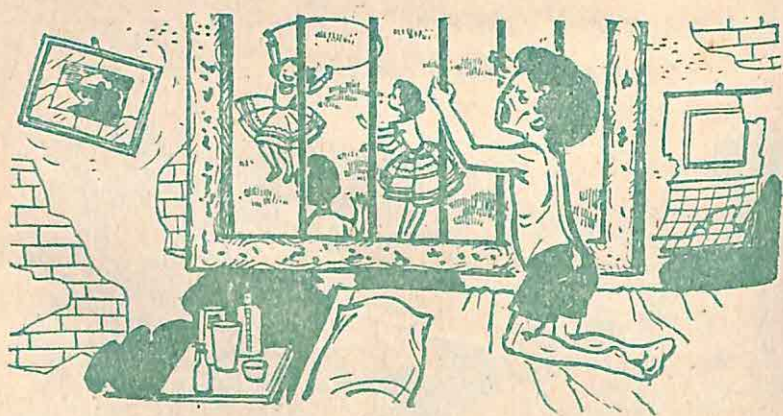
মনের দিক থেকেও যে নিত্যনূতন প্রসারের অধিকারী হতে থাকে; নতুন ভাব, চিন্তা, অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে থাকে; আর হতে শেখে মনোযোগী, একাগ্র। রকমারী নতুন শব্দ

শিখতেও যথেষ্ট সহায়তা সে পায় খেলার মধ্যে। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে এইভাবে তার ভাষাবিকাশ ঘটতে থাকে।

আপনি যদি শিশুকে যথেষ্ট খেলা খেলা থেকে বঞ্চিত করেন, তাহলে তার মধ্যে জাগবে দিবাস্বপ্ন আর আত্মকেন্দ্রিকতা। এ-দুটোই তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, তার জীবন হয়ে পড়বে নিঃসঙ্গ আর বৈচিত্র্যহীন। ক্রমশই দেখবেন, তার মধ্যে আনমনাভাব, অভিমান, অত্যধিক সচেতনতা, ভীরুতার বোঝা বাসা বাঁধছে; আবার যে-সব শিশুর মানসিক কাঠামো অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, তারা হয়ে পড়েছে খিটখিটে, ঝগড়াটে আর কুঁড়ে। বিশেষ করে দৌড়ঝাঁপ খেলা থেকে শিশুকে বঞ্চিত করলে তাদের স্থূল মাংসপেশীগুলির মধ্যে যে উত্তেজনা রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তার অবাঞ্ছিত প্রকাশ ঘটতে পারে যে-কোনসময়ে এবং এভাবে আমরাই অনেকসময়ে এমন সব শিশুর সৃষ্টি করে থাকি, যাদের নিয়ে নানারকমের সমস্যা দেখা দেয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা আধুনিক শিশুমনোবিজ্ঞান-জগতের একটি অভিনব আবিষ্কারের কথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করব। এ-আবিষ্কার হল ক্রীড়ামূলক চিকিৎসা। মেলানি ক্লীন, আনা ফ্রয়েড প্রভৃতি শিশুবিদ্ দুর্বোধ্য শিশুর মানসিক জটিলতা চিকিৎসার ব্যাপারে এই পদ্ধতির ব্যাপক গবেষণা করে আশ্চর্য্যরকম সাফল্যলাভ করেছেন। একটি বিশেষ সুসজ্জিত খেলার প্রাঙ্গণে চিকিৎসাধীন শিশুকে রকমারী খেলনার মধ্যে

ছেড়ে দিয়ে তার খেলার আচরণ, কথাবার্ত্তা অনুধাবন ও পরে বিশ্লেষণ করে অতি স্পষ্টভাবে তার মনের সমস্যার জট খুঁজে পাওয়া যায়।

এখন আপনি একটা প্রশ্ন করলেও করতে পারেন যে, দিনরাত 'খেলা-খেলা' করে কাটালে শিশুকে পূর্ণ জীবনের কঠিন কর্ত্তব্য পালনের শিক্ষা দেওয়া হবে কখন। এর জবাবে আমরা কেবল কার্ল গ্রুসের একটি কথার উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করব। তিনি বলেছেন, প্রাণী যতদিন ছোট থাকে, ততদিন খেলে, একথা বললে ঠিক হয় না, বরং অন্যভাবে বলা উচিত যে, প্রাণীর পক্ষে যতদিন খেলা করবার এবং খেলার দ্বারা পূর্ণ জীবনের কঠিন কর্ত্তব্য-পালন শিক্ষা করার প্রয়োজন থাকে, তার শৈশবও ততদিন স্থায়ী হয়।

কেন এত 'কেন' ?

"শিক্ষক ॥ তোমার এটা করা উচিত নয়।

ছাত্র ॥ কেন নয় ?

শিক্ষক ॥ কেননা এটা অন্যায়।

ছাত্র ॥ অন্যায় ! অন্যায় কাকে বলে ?

শিক্ষক ॥ যেটা তোমার করা বারণ।

ছাত্র ॥ যেটা করা বারণ, সেটা করা অন্যায় কেন ?

শিক্ষক ॥ কারণ অবাধ্য হলে শাস্তি পেতে হয়।

ছাত্র ॥ যখন কেউ দেখে না, তখন যদি করি ?

শিক্ষক ॥ আমরা তোমায় দেখব।

ছাত্র ॥ আমি যদি লুকিয়ে করি ?

শিক্ষক ॥ আমরা জিজ্ঞেস করব, তুমি কী করছিলে।

ছাত্র ॥ আমি যদি মিছে কথা বলি ?

শিক্ষক ॥ মিছে কথা বলা উচিত নয়।

ছাত্র ॥ কেন উচিত নয় ?

শিক্ষক ॥ কেননা, এটা অন্যায়।”....ইত্যাদি

রুশ্যো তাঁর “এমিল” বইয়ের এক জায়গায় ছাত্র ও শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরের এইরকম একটি বর্ণনা দিয়েছেন। লক্ষ্য করলে আপনিও দেখবেন, ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের ধারাটা এমনই একটা ঘূর্ণিপাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে সকলকে। রুশ্যোর ভাষাতেই এই 'ঘূর্ণি'কে বলতে পারেন অনিবার্য্য বৃত্ত। রুশ্যো, কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকরা মানবশিশুর নীতিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে এই ঘূর্ণিপাকে পড়েছিলেন, পরবর্ত্তী কালে শিশু-মনোবিজ্ঞানীরাও শিশুর অনন্ত প্রশ্নধারার উৎস খুঁজতে গিয়ে এমনি বহুবার প্রশ্নঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে অবশ্য এই সব প্রশ্নঘূর্ণির

কথা শুনলে দশ হাত দূর দিয়ে পালাবার চেষ্টাটাই দেখা যায়।

তাতে আমরা বাঁচি বিরক্তির হাত থেকে, কিন্তু নিজেরই তৈরী ঘূর্ণিপাকে ঘুরে মরে ঐ অসহায় শিশু। উদ্ধারের দাবি জানালে তার ভাগ্যে বড়জোর সম্ভাব্য ত্রাণকর্ত্তার চড়চাপড়টা জুটতে পারে।

শিশু-দরদী যাঁরা, তাঁরা সাধারণত বলে থাকেন যে, জানবার অপরিসীম আগ্রহে শিশু এই প্রশ্নঘূর্ণির সৃষ্টি করে। এই জটিলতাপূর্ণ জগতের মধ্যে তার অনুসন্ধিৎসু মনের আকুলতা প্রকাশ পায় এই প্রশ্নধারার মাধ্যমে। প্রশ্নগুলির ঠিক ঠিক জবাব জোগাতে পারলে শিশুর আগ্রহী মন পরমাগ্রহী হয়ে ওঠে।

কথাটা মানতে আপত্তি হবে, এমন লোক অল্পই। তবুও একটা খটকা আছে। ধরুন, রুনু একদিন মাকে জিজ্ঞেস করে বসল, "মা, তোমার কাপড়ের ধারে ধারে কেমন ফুল-কাটা, বাবার কাপড়ে অমন নেই কেন?" এ-প্রশ্নের 'ঠিক জবাব' মা খুঁজে পেলেন না, তাই বললেন, "তুমিই বল না!" একটুও না-ভেবে রুনু চট্‌পট্‌ জবাব দিলে, "তোমাকে ভাল দেখায় বলে!".... এখন বলুন ত, এতখানি 'ঠিক জবাবটা' শিশু নিজে জানা সত্ত্বেও কেন প্রশ্ন করেছিল? শিশুর এই 'কেন'-র উপরে যখন মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণী দৃষ্টি পড়ল, তখন পাওয়া গেল শিশুমনের যুক্তিক্ষমতা বিকাশের এক অতি চিত্তাকর্ষক পদ্ধতির পরিচয়। লুইস্‌ নামে এক শিশু-প্রশ্নবিশারদের মতে, জবাব জেনে-শুনেও কোন প্রশ্ন যদি কোন শিশু করে, তবে

সেটা তার ন্যাকামি বা বড়দের অযথা বিরক্ত করবার একটা ফন্দী বলে মনে করা মোটেই ঠিক নয়। আসলে এরকম প্রশ্নের দ্বারা সে তার নবলব্ধ কোনও ধারণা বা জ্ঞানকে দৃঢ়তর করতেই চায় মাত্র। এ যেন প্রশ্নের ছদ্মবেশে সে নিজের গড়া ধারণা বা জ্ঞানের সমর্থন চাইছে বড়দের কাছে! তাই সহানুভূতির পাত্র সে নিশ্চয়ই।

বিশেষজ্ঞরা সকলেই বলছেন যে, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের ধারা যতই আবোল-তাবোল হোক না কেন, তারই মধ্যে তার সত্যিকারের মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কারণ শিশুর প্রশ্ন শিশুরই নিজস্ব অভিব্যক্তি। ভাষার প্রথম ধাপে পা দিয়েই তার চিন্তাস্রোতের গতি বহির্মুখী হতে শুরু করে।

বহির্জগতের নিত্যনতুন অভিজ্ঞতাকে তার সহজাত যুক্তি-ক্ষমতার স্পর্শে সঞ্জীবিত করে চিন্তাভাণ্ডারের বিরাট কাঠামোর সংগঠন চালাতে থাকে। এই সংগঠন-মহাযজ্ঞের প্রাথমিক সাহায্য সে প্রার্থনা করে বড়দের কাছে প্রশ্নেরই মাধ্যমে।

রুনু যদি জিজ্ঞেস করে আপনাকে, "গাছে পাতা হয় কেন?"—আপনাব জবাব দেওয়ার আগে জেনে নিন তার মনে কোন জবাব ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে কি না। তাই

থেকেই আপনার জবাবকে পথ খুঁজে নিতে হবে। অকস্মাৎ আপনি একটা 'সঠিক' জবাব দিলে তার মনের ধারণার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে, সে-ধারণা অন্য দিক দিয়ে নির্ভুল হলেও। কেননা, গাছের পাতা হওয়ার কারণ আপনি বলবেন—পাতা দিয়ে গাছ সূর্য্যের আলো শুষে নেয়; আর একজন বললেন—পাতার সাহায্যে গাছ রোদ-জলের হাত থেকে বাঁচে। এদিকে রুনুকে জিজ্ঞেস করুন, ও হয়ত সাদাসিধে বলে দেবে, "দেখতে সুন্দর হয়"। ওর ধারণাটা কি একেবারেই বাজে? তাই বলি, শিশুর প্রশ্নের জবাব দেবার আগে তার মনের ধারণা জেনে নিন। মনে রাখবেন, তার ধারণার পিছনে যে যুক্তি থাকে, তা অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা হলেও সব ক্ষেত্রেই তাকে একেবারে বরবাদ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

শিশুর প্রশ্ন সম্পর্কে এযাবৎ যত গবেষণা হয়েছে, তার মধ্যে পীআজে নামে এক ভদ্রলোকের গবেষণার ফল শিশু মনোবিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ মূল্যবান হয়ে আছে। পীআজের মতে, শিশুরা সব প্রশ্নই কেবল 'কিছু জানবার জন্যে' করে না। কোন বিষয়ে খুব অবাক হলেও তারা সেই মনোভাবটি প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করে থাকে।

সদ্যোজাত ভাইকে দেখে খোকা যদি বলে: 'ও কোথায় ছিল, মা?'—তাহলে বড়রা নিতান্তই বিপদে পড়ে যান এই জেরার মুখে। এসব ক্ষেত্রে বিস্ময়কে প্রাধান্য দিয়ে 'ভগবান

পাঠিয়েছেন'-জাতীয় জবাব দেওয়াটা খুব দোষের বলে মনে হয় না। কেননা, শিশুর জ্ঞানপিপাসা মেটাবার খাতিরে তার কাছে জন্মরহস্য ব্যাখ্যা করতে যাওয়াটা নিশ্চয়ই বাতুলতা বলে গণ্য হবে। ফ্রয়েড-পন্থীদের বিশ্বাস, এ-ধরনের প্রশ্নের পেছনে শিশুর যৌন-অনুসন্ধিৎসার উস্কানি আছে। তাঁরা বলেন, জন্মসংক্রান্ত প্রশ্নের খানিকটা স্পষ্ট আলোচনা করলে শিশুর বিকৃতি যৌন চিন্তা কমতে পারে।

খুব ছোট, অর্থাৎ ৭।৮ বছরের নিম্নবয়স্ক ছোটদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অবশ্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রস্তাবনা না করাই ভাল। পীআজে যদিও তাঁর গবেষণায় দেখেছেন, তিন বছর বয়সেই শিশু বেশ প্রশ্নপটু হয়ে পড়ে, তবুও তিনি স্বীকার করতে চাননি যে, ঐ বয়সে শিশু তার প্রশ্নের মাধ্যমে

কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করতে চায়। ডেভিস, স্মিথ, লুইস্ প্রভৃতি গবেষকরাও এই অভিমত সমর্থন করে বলেছেন,

৭।৮ বছর বয়সের আগে শিশু যে-সব প্রশ্ন করে, সেগুলির পিছনে প্রক্ষোভের তাড়নাই থাকে বেশী।

সব শিশুরই প্রশ্নের মধ্যে মানুষের কাজকর্ম্ম এবং মনের ইচ্ছা-সম্পর্কিত প্রশ্নের সংখ্যাই বেশী থাকে। ৭।৮ বছরের আগে এ-ধরনের প্রশ্নই থাকে প্রায় শতকরা ৫০টি। বয়স যত বাড়ে, ততই "কখন-প্রশ্ন" বাড়তে থাকে, আর "কোথায়"-প্রশ্ন কমতে থাকে। "কেমন করে হলো"—এ ধরনের প্রশ্ন ৭।৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়েরা বড় একটা করে না। করলেও বিস্তৃত জবাবের বিশেষ অপেক্ষা রাখে না। মোটামুটি এক কথায় একটা কারণ বুঝিয়ে দিলেই ক্ষান্ত হয়। ছ'বছরের খোকনকে সঙ্গে করে নিয়ে রোটারী মেশিন দেখতে গেছেন; ও জিজ্ঞেস করল, "কী করে কাগজ বেরুচ্ছে?" তখন যদি আপনি সারা মেশিনের চতুর্দ্দিকে ঘুরে কাগজ ছাপার কাণ্ডকারখানা দেখাতে শুরু করেন, তাহলে নিতান্তই বাজে খাটুনি হবে।

আরও মুশকিল এই যে, জড় পদার্থের ওপর ছোটদের আগ্রহ বড় কম। রোটারী মেশিন যখন গম্‌গম্ করে চলবে, তখন ওর মুখে হাজারো-প্রশ্নের তুবড়ি ফুটবে। কিন্তু নিৰ্জ্জীব মেশিনের সামনে ওর সমস্ত অনুসন্ধিৎসাই ঝিমিয়ে পড়বে। প্রাণচঞ্চলতার প্রতি তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। মিউজিয়ামের জন্তুঘরে এবং চিড়িয়াখানার খাঁচার সামনে একই শিশুর দুরকম তৃপ্তি দেখেছেন যাঁরা, তাঁদের নিশ্চয়ই এ-কথাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবার দরকার হয় না।

শুনলে অবাক হতে হয় যে, শিশুরা প্রথম দিকে যে-সব প্রশ্ন করে, সেগুলি আদপেই "জানবার প্রশ্ন" নয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এই রকমই বিশ্বাস। তাঁরা বেশ জোর দিয়েই বলেন যে, প্রথম বয়সে শিশুর প্রশ্নগুলি কেবল "কথাবলা-খেলা" ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সঙ্গে মানুষ কথা বলুক, এটাই শিশুর সহজাত ইচ্ছা। টুকটুকে ঝুমঝুমিটা যখন খুকুর হাতে পড়ল, তখন একটা বিশেষ ধরনের "এ—এ" শব্দ করে সে খেলনাটি তুলে ধরবে আপনার সামনে। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এইরকম "এ—এ" শব্দই শিশুর প্রথম প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য অপরকে কথা বলান। আপনি ঝুমঝুমিকে উপলক্ষ্য করে কিছু বলুন,—দেখবেন, আপনার বক্তব্যের বিষয়বস্তুর দিকে বিশেষ আমল না দিয়ে সে কেবলই পরমোৎসাহে "এ—এ" করে চলবে।

ভাষা শেখবার জন্যে অতি অল্প বয়স থেকেই শিশু তার আপন আন্তর প্রয়োজনে এইভাবে বড়দের সঙ্গে "কথাবলা খেলা" শুরু করে নিজের অস্ফুট প্রশ্নের মাধ্যমে। জবাবস্বরূপ বড়দের কাছ থেকে যা শোনে, তাকে অনুকরণ করবার চেষ্টাও চলে সঙ্গে সঙ্গে। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে এবিষয়ে শিশুর অক্লান্ত পরিশ্রম বেশ বোঝা যায়। একেবারে মাস-দশেক বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায় এই অধ্যবসায়।

এই "কথা-বলা খেলা" এবং বড়দের ভাষার অনুকরণ চলে প্রায় আড়াই বছর পর্য্যন্ত। এর ফলে তখনও অবধি শিশুর

প্রশ্নের মধ্যে তথ্য-অনুসন্ধানের কোন ইচ্ছাই খুঁজে পাবেন না। এই সময় থেকেই শিশুর মনে সমাজ-চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে এবং কোন বিষয়ে জবাব চাইলে বড়দের সহযোগিতা পাওয়া যাবে, এইরকম একটা ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। ফলে দু-আড়াই বছর বয়স থেকে ৯।১০ বছর পর্য্যন্ত তার প্রশ্নের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলে, অবশ্য পথ খোলা পেলে। কিন্তু ৮।১০ বছর থেকেই হঠাৎ প্রশ্নের সংখ্যা কমতে শুরু করে, কারণ তখন শিশু একটা বড় রকম মানসিক ও শারীরিক সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। এই বয়সন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েরা সকলেই খানিকটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

ছোটদের সবরকম প্রশ্নের মধ্যে "কেন"-প্রশ্নের বৈচিত্র্য ও রহস্যই মনোবিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশী চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। রানুর পুতুলের মুণ্ডুটা সেদিন গেল ভেঙে; পিসী বলল, "পুতুলটা মরেই গেল।" কদিন পরে ঠাকুমা কথায় কথায় ওকে বলছেন, "আমি আর কদিনই-বা বাঁচব বল"—অমনি রানু জিজ্ঞেস করে বসেছে: "আচ্ছা ঠাকুমা, মরে গেলে মুণ্ডুটা ভেঙে যায় কেন?" এই প্রশ্নের উৎস কোথায় যাঁরা জানেন, কেবল তাঁদের মুখেই এর একটা যুতসই জবাব এলেও আসতে পারে। কিন্তু ঠাকুমার পক্ষে এমন প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, সন্দেহ নেই।

নিষ্প্রাণ জড়পদার্থের মধ্যেও প্রাণের অনুমান শিশু-মনের এক পরম বৈশিষ্ট্য। তাই সে মহাবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেঃ "চেয়ারটা আমার মত দুপায়ে দাঁড়াতে পারে না কেন?"— মনে রাখবেন, চেয়ারের চতুষ্পদতার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সে মোটেই জানতে চায় না; যে-চেয়ারের দুটি "হাত" আছে, মানুষের

মত তার দুটি পা-ই যথেষ্ট —এই তার যুক্তি! চেয়ারের মধ্যে মানুষের মতই প্রাণ আছে, এই অনুমানেই সে চেয়ারকে মানুষের মত দুপায়ে দাঁড়াতে দেখতে চায়। নিষ্প্রাণের প্রাণ কল্পনার এই প্রবৃত্তিটি মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি এবং সকল শিশুকেই এই প্রবৃত্তির অনুশীলন করে পূর্ণতর মানবতার দিকে এগুতে হয়।

এই পূর্ণতর মানবতার দিকে এগুবার পথে তার অন্যতম প্রধান বাধা হল সমাজবোধের অভাব। সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে তার অক্লান্ত প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি ঘটে এলোমেলো প্রশ্নের মধ্যে। আসলে, সমাজের সঙ্গে চিন্তা-বিনিময় এবং সামাজিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যেই এই প্রশ্ন-প্রবৃত্তির মূল উৎস। তবে প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন শিশুর প্রশ্নগুলি প্রথম দিকে নিতান্তই খাপছাড়া

ও বিরক্তিকর হয়ে থাকে। শুধু ছোটদের কেন, মৌলিক জ্ঞানের অপ্রাচুর্য্য থাকলে বড়দের প্রশ্নের মধ্যেও অনেক সময় বিরক্তিকর খাপছাড়া ভাব দেখা যায়। এর ফলে দুটি অসংলগ্ন বিষয়ের মধ্যেও একটা সম্পর্ক আছে মনে করে এমন একটা প্রশ্ন করা হয়, যার কোন জবাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মৃত্যু সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এখনও লাভ করেনি বলেই রান্নু তার ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করেছিল মুণ্ডচ্ছেদ এবং মৃত্যু সম্পর্কীয় ঐরকম একটি উদ্ভট প্রশ্ন।

"ক্রন্দন" থেকে হয় "কাঁদা", "বন্ধন" থেকে "বাঁধা" এবং "রন্ধন" থেকে "রাঁধা"। নতুন-ভাষা-শেখা ছেলেমেয়েদের কাছে এ-নিয়মটা বেশ পছন্দসই। কিন্তু তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, যখন "ক্রন্দন" এবং "রন্ধন" কান্না এবং রান্না হওয়া সত্ত্বেও বন্ধন "বাঁধা" ছিঁড়ে অন্যপথে পা বাড়ায় না। ছাত্র যখন জিজ্ঞেস করেঃ "স্যার, বন্ধন থেকে 'বান্না' হবে না কেন ?"— তখন শিক্ষককে মুশকিলে পড়তে হয় বই কি!

এ-ধরনের প্রশ্নের পিছনে আছে, একটি জ্ঞান থেকে সাধারণীকৃত জ্ঞানের অনুমান করার একটা প্রবৃত্তি। প্রথম-শেখার স্তরে এই প্রবৃত্তিই শিশুকে অনুসন্ধিৎসু করে রাখে। সাধারণত ব্যাকরণের নিয়ম বা সমাজের চলতি কোন রীতিনীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কেই শিশু এই ধরনের প্রশ্ন তোলে, দেখা গিয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, শিশুর প্রাক্ষোভিক পরিবেশ তার প্রশ্নের পটভূমি সৃষ্টিতে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ তার মনে যতই প্রাক্ষোভিক দ্বিধার সৃষ্টি করবে, প্রশ্নের সংখ্যা এবং জটিলতা ততই বাড়বে। শুধু তাই নয়, যে-শিশু তার প্রশ্নের জবাব মুখে মুখেই পেয়ে যায়, তার প্রশ্নের উৎসাহ কেবলই বেড়ে চলে। একটু সচ্ছল ঘরের ছেলেমেয়েরাই এই সুযোগটা পেয়ে থাকে। গরিব ঘরের অভিভাবকরা পাঁচ-ঝঞ্ঝাটে থাকেন বলে শিশুর প্রশ্নের দিকে তাঁরা মোটেই নজর দিতে পারেন না। ফলে শিশুর প্রশ্নের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শিশুর সমাজচেতনা জাগতে যেমন দেরি হয়, সুষ্ঠু ভাষা-বিকাশেও সে তেমনি পিছিয়ে পড়ে। এ ছাড়া নানারকমের খেলনা ছবির বই প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসও শিশুর প্রশ্নপ্রবণতায় যথেষ্ট ইন্ধন জোগায় এবং দুঃখের বিষয়, গরিব বাপ-মা এগুলি কিনতে পারেন না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছোটদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

তাদের প্রশ্নস্পৃহাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রশ্ন জিনিসটা যখন শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তখন সকল স্তরের অভিভাবককেই এ বিষয়ে শত অসুবিধা সত্ত্বেও যথাসম্ভব মন দিতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে, বয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করলে শিশু তার প্রশ্নের স্পৃহাকে অন্তত খানিকটা তৃপ্তি দিতে পারে। তাই, সম্ভব হলে শিশুকে সে-সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য তার কুফল সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে।

সবশেষে, এ-কথাই বলতে হয় যে, মানবশিশু সমাজবদ্ধ প্রাণীর বংশধর। সমাজের সযত্ন দৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করতেই হবে, তার আত্মবিকাশের জন্যেই। তাই তার অহরহ এত প্রশ্ন, এত "কেন"। তার প্রশ্নকে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করার অর্থ মানবসমাজের ভিত্তি আল্‌গা করে দেওয়া,—মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি, শিশুকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলা।

কাঁদে শিশু ...

শুনতে পাচ্ছেন ?....হয়ত শুনে শুনে আর কানে বাজে না। অমন কত সুর আকাশে-বাতাসে যাচ্ছে মিলিয়ে, কে আর অত শোনে! হয়ত বলবেন, 'ছোটরা অমন একটু কেঁদেই থাকে।'—কেউ বা বলবেন, 'ছেলে কাঁদলে ফুসফুসের শক্তি বাড়ে।' আবার কারুর মতে চোখের জলে চোখ তো বটেই এমন-কি মনেরও অনেক ময়লা নাকি খোলসা হয়ে যায়! সে সব কারণেই পাশের গেরস্থ বাড়ীতে অনবরত ছেলের কান্নাটা কানে তুলেও তুলি না; নিতান্ত কানে লাগলে বলি, 'ও বাড়ীর ছেলেটা, ভারী ছিঁচ-কাঁদুনে!'....আর নিজের ঘরের কাচ্চাবাচ্চা কাঁদলে প্রথমে আধখানা মোয়া ধরি, সেটা কাজে না লাগলে বাচ্চার চোখে ধোঁয়া দেখিয়ে ছেড়ে দিই।

এমনি করেই আমাদের 'কাচ্চাবাচ্চার ঘরে' শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করতে হয়।

সমস্যার কথা সন্দেহ নেই গেরস্থ বাড়ীগুলোকে শিশুর কান্নাশূন্য রাখাটা। ধরুন, সন্ধ্যেবেলা কর্ত্তা বাড়ী ফিরেছেন, দু'একজন আত্মীয়স্বজন এসেছেন ; চা-জলখাবার চলছে, সবাই একটু আলাপ-সালাপ করছেন। গিন্নীও আলাপে বেশ বড় রকমের অংশ গ্রহণ করছেন, তা তাঁরা করেই থাকেন। ঘরের আরেক কোণে কিংবা পাশের ঘরে স্কুলেপড়া ছেলেটি হেলেদুলে চোখ বন্ধ করে ভূগোলের নাম মুখস্থ করছে তারস্বরে। অতিথিদের আনন্দ দেবার জন্যে রেডিওর সঙ্গীত-লহরীও ঘরের মধ্যে এক অভিনব আবেশের সৃষ্টি করেছে। এমন
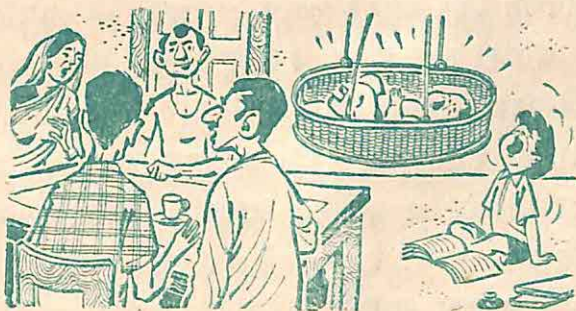
সময়ে দোলনার মধ্যে থেকে খোকার এ্যালার্ম শোনা গেল! এখন বলুন তো, কর্ত্তা বা গিন্নীর এখানে কি রকম মনের অবস্থা হতে পারে?

মা খোকাকে কোলে নিয়ে নাচাতে-দোলাতে লাগলেন। কিন্তু নাচুনি আর দোলুনি খাওয়ার জন্যেই তো খোকনমণি কান্না ধরেনি, অতএব তার কান্না বেড়েই চল্‌ল। কর্ত্তা বুদ্ধি করে বল্‌লেন, 'বোধ হয় খিদে পেয়েছে ওর, ফিডিং বোতলটা ধরলেই থামবে।'—সেটাও যখন ব্যর্থ হল, তখন আলাপী-মজলিশের রসভঙ্গ হলো—মজলিশ ভাঙ্‌ল। খোকাকে কেন্দ্র করে বাবা-মার মনে ক্রোধের পাহাড় গড়ে উঠ্‌ল।

খোকার এই বিদ্রোহী কান্নার পেছনে শিশু-জাতির মানসিক প্রক্ষোভের কতকগুলি সূত্র কাজ করে, যেগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার ফলেই শিশুর কান্না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাবা-মার মানসিক ধৈর্য্যচুতি ঘটায়। ছোটরা যখনই কাঁদে তখনই বুঝতে হবে, এর মূলে আছে কোন অস্বস্তি। সহানুভূতিশীল মানুষ মাত্রেই বুঝতে পারবেন, এই অস্বস্তিকে ভাষায় প্রকাশ করে স্বস্তির সুব্যবস্থা করার ব্যাপারে শিশু কতখানি অসহায়। তাই জেনে রাখা ভাল, শিশুর অস্বস্তির প্রতিবিধানে যে অক্ষমতা, সেটা জন্ম দেয় ক্রোধের। ক্রোধ সৃষ্টি করে দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা। শিশুর সদা-সঞ্চল একখানি পা চেপে ধরে রাখুন, স্পষ্ট দেখ্‌বেন, পা ছাড়াতে না পারার ফলে তার ক্রোধের সৃষ্টি হচ্ছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এই ক্রোধের পরে আসবে দৈহিক আক্ষেপ, ছটফটানি এবং এর পরবর্ত্তী অবস্থাই হল কান্না। শিশুর ছুটোপাটি খেলার মাঝে

বাধা দিলে ঠিক এই কারণেই তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং চীৎকার করে।

শিশুর কান্না সম্পর্কে একটু জানবার চেষ্টা করলেই এ তথ্যগুলি পরিষ্কার জানা যায়। সন্ধ্যেবেলা খোকনমণি যে কান্না শুরু করেছিল, তার পেছনে কি অস্বস্তির কারণ ছিল—এখন প্রশ্ন হতে পারে। কারণ ছিল একাধিক। মায়ের দোলানি আর ফিডিং বোতল যখন ব্যর্থ হল তখন বুঝতে হবে আসলে ও-দুটির অভাবে সে কাঁদেনি। তার অন্যান্য যে সমস্ত অস্বস্তি হয়ে থাকতে পারে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঘরের গোলমাল। তাছাড়া লোক-সমাগমের ফলে ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেনের অভাবও শিশুর অস্বস্তির একটা কারণ হতে পারে। এই গেল সাদাসিধে কয়েকটি কারণ। এ-ছাড়া আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে খোকার দৈহিক ও মানসিক অন্যান্য জটিলতার কথাও জানা যেতে পারে।

নাদুস-নুদুস ছেলেপিলেই খুব স্বাস্থ্যবান হয়, এ-রকম একটা ধারণা অনেক মায়ের আছে। ছেলেমেয়ে যতক্ষণ না ওজনে ভারী হচ্ছে, ততক্ষণ দুধ, হরলিক্স, হেনতেন খাইয়েই চলেন। কচি ছেলে কাঁদামাত্রই 'ওরে বোতলটা খোকার মুখে ধর'—এ রকম নির্দেশ মায়েরা অনেকেই দিয়ে থাকেন। খাওয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নের ফলে শিশুরা প্রায়ই পেটরুগী হয়ে পড়ে। কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ফাঁপা—এ সব কারণে যখন ছোটরা অস্বস্তি বোধ করে কাঁদে, স্নেহশীলা মায়েরা তখন
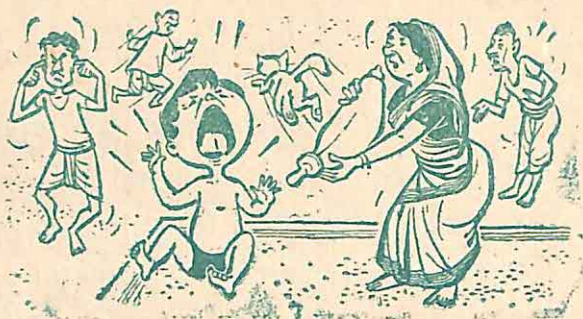
কান্নার কারণ না বুঝতে পেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই মনে হয়, মায়েরা ছেলেমেয়েদের সব কষ্ট সব সময়ে বোঝেন,—কথাটা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়।

মুস্কিল হয়েছে কি, শিশুর কোন্ কান্নাটা কোন্ ধরনের অস্বস্তির জন্যে সৃষ্টি হচ্ছে, কান্নার সুর বা ভঙ্গিমা থেকে সেটা বোঝা ভারী শক্ত ব্যাপার। অন্ততঃ বাঁধাধরা ফর্মুলার মধ্যে ফেলে বলা যায় না, জগৎজোড়া সমস্ত ছেলেমেয়েই একটি বিশেষ সুরে কাঁদে। তবে জন্ম থেকে যত্নের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করলে শিশুর কোন্ কান্নাটি কি জন্যে হচ্ছে, মায়েরা তার পরিষ্কার একটা আভাস নিশ্চয়ই পেতে পারেন। কিন্তু শিশুর প্রথম মাসে কান্নার মধ্যে কেবলমাত্র তীক্ষ্ণতার তারতম্য ছাড়া আর কিছু বোঝা প্রায় অসম্ভব, এটা জেনে রাখা দরকার। নানান্ দেশের শিশুর কান্না যাচাই করে কেবলমাত্র একটি বিশেষ কান্না সম্পর্কে মোটামুটি সাধারণ লক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। সেটি হল পেটের যন্ত্রণায় কান্না। শিশু

যখন পেটের তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পায়, তখন তার কান্নার সুরটা হয় একটু চাপা, যেন অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে কাহিল হয়ে গেছে। স্তিমিত চোখে থাকে জল আর হাত-পা ছোঁড়া বা চলাফেরার মধ্যে দেখা যায় একটা আড়ষ্টভাব। অবশ্য এ লক্ষণ লিখে বোঝান সবটা সম্ভব নয়।

হয়্যার নামে এক জার্ম্মাণ শিশু মনোবিদ বলেছেন যে, জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরে শিশুর সাধারণ অস্বস্তির কান্না এবং খিদে-পাওয়ার কান্নার মধ্যে একটা পার্থক্য ধরা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রথম ধরনের কান্নার সুর দ্বিতীয়টির চেয়ে একটু বেশি নাকিসুরে হয়ে থাকে। ব্যুহ্লার বলেন, খিদে পাওয়ার কান্নার মাঝে মাঝে শিশুর মুখে যেন কোন কিছু চোষবার ভঙ্গী দেখা যায়।

আরো একটা জিনিষ গবেষণা করে বোঝা গেছে যে, জন্মের কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শিশুর কান্নার অধিকাংশ কারণই তার দেহের মধ্যেই থাকে। অর্থাৎ বাইরের জগতের শব্দ, অন্ধকার ইত্যাদি তার মনে ভয় এবং ফলে কান্না জাগাতে বড় একটা পারে না। তার কারণ অত অল্প বয়সে তার গ্রাহক স্নায়ুগুলি কর্ম্মক্ষম হয়ে ওঠে না। শিশু দুর্ব্বল হলে এই অবস্থাটা কাটতে মাসখানেকও লাগতে পারে। এই সময়টাতে শিশু কাঁদলে তার দেহের আভ্যন্তরীণ অস্বস্তির কথাটাই আগে ভাবতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে, শিশুর সব কান্নার পেছনেই আছে

অস্বস্তি। এ অস্বস্তি ক্রোধ থেকে জন্মাতে পারে, ভয় থেকেও হতে পারে। তবে জন্মের প্রথম সপ্তাহে শিশুর কান্নার সঙ্গে সাধারণত যে হাঁপানোর লক্ষণ দেখা যায়, অনেকের মতে ওটাতে শিশুর কোন অস্বস্তি হয় না, বরং শরীরের নতুন কলকব্জাগুলোকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে ওধরনের কান্নার নাকি প্রয়োজন আছে। প্রথম কয়েক সপ্তাহে শিশুর কান্নার সময়ে কপালে হাত দিলে কান্না বেশ থেমে যায়। এর কারণ মনে হয়, এই সময়ের কান্নায় মারাত্মক রকমের অস্বস্তি কিছু হয় না, সে শুধু নিরাপত্তার একটা আভাস পেতে চায়। এই সঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, প্রথম কয়েক সপ্তাহে শিশুর কান্নার স্বর যদি অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মস্তিষ্কের সামনের অংশটুকু অত্যন্ত অপরিণত। মস্তিষ্কের কোন বিকৃতি বা অস্বাভাবিকত্ব থাকলে শিশুরা সাধারণত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ স্বরে প্রচুর কাঁদে। সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুরা যতক্ষণ জেগে থাকে, তার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ঘণ্টা-পিছু গড়ে ১০।১৫ মিনিট সময় কেঁদেই কাটাতে পারে। কিন্তু তার বেশী হলেই দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণবুদ্ধি শিশু বলে তাকে সন্দেহ করা চলে। যে সব শিশু বাপ-মায়ের ন্যূনতম যত্নটুকুও পায় না, নিতান্তই অবহেলার মধ্যে মানুষ হয়, তাদের কান্নার স্বরও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। একারণে কান্নার কান-ফাটানো আওয়াজ শুনে শিশুর প্রকৃতি বিচার করবার আগে তার বংশগতি ও

পরিবেশের একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার পর্য্যবেক্ষকের।

আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে যে, সাধারণত দু'সপ্তাহ বয়স হলে শিশুর খুব কাছে থেকে কোন একটা মৃদু শব্দের দ্বারা তার কান্না থামান চলে, তার আগের বয়সে শব্দ কোন কাজে আসে না কান্না থামানর ব্যাপারে। গান শুনিয়ে শিশুর কান্না থামানর একটা মুস্কিল দেখা গেছে যে, গান থামালেই আবার কান্না স্থুরু হয়।

এক মাসের ছোট্ট শিশুটি বিছানায় শুয়ে একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে। মা রান্না-ঘর থেকে এসে বললেন, 'দুষ্টু ছেলে, চোখে একফোঁটা জল নেই, কান্না হচ্ছে!'....বলে চুষিকাঠিটা মুখে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন নিজের কাজে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড,—চুষিকাঠি ফেলে আবার স্থুরু হয় ভাষাহীন শিশুর সেই শুকনো কান্না—বিশ মিনিট, আধঘণ্টা একটানা। মা যতবারই আসেন, দেখেন চোখে নেই জল। ভাবেন, এ খোকার দুষ্টুমী। একটু-আধটু আদর করে চলে যান।.... মায়েরা যদি একটু যত্ন নিয়ে বাচ্চাদের কান্না লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাদের চোখে সাধারণত জল দেখা যায় না। সম্ভবত এই সময়ে তাদের ক্রন্দন-গ্রন্থি পুষ্ট হয়ে ওঠে না। অবশ্য এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা সময় নেই। কোন শিশুর জন্মের তিনচারদিন পরেই কান্নার সময়ে চোখে জল দেখা যায়, আবার কোন

কোন ক্ষেত্রে চার পাঁচ মাসও লাগতে পারে। অতএব কান্নার সময়ে চোখে জল না থাকলে শিশুর কোন কষ্ট হচ্ছে না মনে করাটা খুবই নির্ম্মমতা।

শিশু চোখের জল ফেলার পরিণত বয়সে পৌঁছলেও সব কান্নার সময়েই সে চোখের জল না ফেলতেও পারে। চোখে জল আসে তখনই, যখন একাধিক প্রক্ষোভের দ্বারা আমরা আহত হই। শিশুর বেলাতেও এই কথাটি খাটে। কেবলমাত্র রাগ কিংবা শুধু যন্ত্রণার ফলে যে কান্না হয়, তাতে

চোখের জল না পড়তেও পারে। রাগের সঙ্গে যদি দুঃখ, যন্ত্রণার সঙ্গে যদি অভিমান মিশে যায়, তখন নিশ্চয়ই উঠ্‌বে চোখ জলে ভরে।

ঘরে ঘরে এ নালিশটা শোনা যায় যে, বাচ্চাদের পোষাক পরাতে গেলে বা স্নান করাতে গেলে ভারী গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলে। মাত্র একমাস বয়স থেকেই শিশুরা এই উৎপাত সুরু করে দেয়। এটা হয় প্রধানত শিশুর চঞ্চল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আমরা ঐ সময়ে বাধা সৃষ্টি করে থাকি বলে। জোরজুলুম করে এ-সব ব্যাপারে শিশুকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়ার ফলে পোষাক অথবা স্নানের ওপর তার একটা বিরূপ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার কুফল হয় দীর্ঘস্থায়ী। পোষাক পরানো বা স্নান করানোর মত

এ-ধরনের সবরকমের কাজেই শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর যত কম বাধা সৃষ্টি করা যায়, ততই ভাল।

খিদে এবং দৈহিক যন্ত্রণা ছাড়াও অনেক শিশু ঘুম থেকে উঠেই বিরক্তিকর প্যান্‌প্যানানি সুরু করে দেয়। এ ধরনের কান্না কিন্তু প্রত্যেকদিনই হবে তার কোন মানে নেই। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এসব কান্নার পেছনে অস্বস্তিকর স্বপ্নের প্রভাবটাই খুব বেশি কাজ করে। তিন বছরের একটি শিশুর কথা বলি। সে মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠেই 'মা' 'মা' করে এদিক-ওদিক খুঁজত আর কাঁদত। তার কান্নার সুর আর চোখের চাহনির মধ্যে একটা আহত বেদনার আভাস অতি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত। যতক্ষণ না সে মায়ের সান্নিধ্য পেত, ততক্ষণ কারোর আদর-যত্ন, সান্ত্বনা—কিছুই মানত না; চোখের জলেই সব ভাসিয়ে দিত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, অবোলা শিশুর দুর্বোধ্য ব্যবহারে তার মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রায়ই বলতেন, 'এ-খোকনকে ছেড়ে আমি চলে যাব, নতুন খোকন আনব।'.... প্রায়ই একথাটা শুনে খোকনের মনে নিরাপত্তা-বোধের অভাবটা এমনই বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিল যে, স্বপ্নের মাঝে সে এর অস্বস্তিকর পরিণতি দেখে মা-হারানোর বাস্তব শূন্যতা উপলব্ধি করত। তাই জেনে রাখা ভাল যে, কোনো অপ্রীতিকর ভবিষ্যতের ভয় দেখানোটা অনেক সময়েই শিশুর কান্নার দুর্বোধ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কান্না থামানোর জন্যে কোনরকম তাড়না খুবই খারাপ, কারণ তাতে আপাতফল পাওয়া গেলেও সেগুলি ভবিষ্যতের অকারণ কান্নার ইন্ধন জোগায়। শিশুর মনে অনেকগুলি প্রক্ষোভ অবদমিত হলে সবগুলি মিলে এমন একটি অস্বস্তির সৃষ্টি হয়, যার সান্ত্বনার পথ শিশু নিজেই খুঁজে পায় না। এই ধরনের শিশুদেরই আমরা বলি 'ছিঁচকাঁদুনে'। তারা কোন জিনিসেই সন্তুষ্ট হতে পারে না; একটা আব্দার মিটলে পরমুহূর্ত্তেই আরেকটা নতুন আব্দার নিয়ে জ্বালাতন সুরু করে। অনেক সময় অবহেলিত শিশুরাও বাপ-মায়ের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করে। ছিঁচকাঁদুনেমী সারানো ভারী শক্ত ব্যাপার, এর প্রভাব মানুষের পরিণত ব্যক্তিত্বের ওপরেও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। তাই, তাড়নার সাহায্যে শিশুর কান্নার অকারণ অবদমনের ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকদের বিশেষ সংযত হওয়া দরকার।

তবে একটা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, শিশু যেন 'কিছু-করিয়ে-নেবার' মহাস্ত্ররূপে তার কান্নাকে ব্যবহার করতে না শেখে। অন্ততঃ এটা তাকে বুঝতে দেওয়াটাই হবে বিপজ্জনক।

এটা বোঝা সহজ যে, কান্নার পেছনে রাগ, ভয় ইত্যাদি

প্রক্ষোভ আছে। প্রক্ষোভগুলি যখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে, তখন দেহের স্নায়ুগুলিকে প্রক্ষোভের একটা বড় রকমের ধাক্কা সইতে হয়। এর ফলে স্নায়ুগুলির স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের খুব ক্ষতি হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা, হঠাৎ জেগে ওঠা—এসব উপসর্গ এসে জোটে। ক্রমে ক্রমে এইসব উপসর্গ থেকেই শিশু তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হারায়।

অনেক দাদাদিদি আছেন, যাঁরা ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুনসুটি করে রাগিয়ে দিয়ে তাদের নাকিসুরের কান্না শুনে খুব আমোদ পান। এ ধরনের বিশ্রী আমুদে-স্বভাবের ফলে শিশুর মেজাজের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার ফলে সে চারিপাশের জন-মনিষ্যির ওপর একটা অতি বিরক্তিকর তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি করে। যাঁদের

কাছ থেকে শিশু সত্যিকারের স্নেহ পেতে পারে, তাঁদের কাছেও এই কারণে সে ঘেঁষতে সাহস পায় না। ক্রমে সে আত্মকেন্দ্রিক এবং পরে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে; কেউ কাছে গেলেই খেঁকিয়ে ওঠে। আমরা তখন কপাল কুঁচকে বলি: "ছেলেটা বড় অসভ্য।"

কান্নার যেমন কুফল আছে, উপকারিতাও তেমনি আছে বৈকী! নইলে এ জিনিষটির ওপর আমাদের এত অধিকার

দিয়েছেন কেন বিধাতা! রুদ্ধ প্রক্ষোভের মুক্তি দেবার নানারকম উপায়ের মধ্যে কান্না হল একটি। ব্যথা-অভিমানের যেসব প্রক্ষোভ মানুষের দেহ ও মনকে জীর্ণ করে তোলে, তার আবর্জ্জনা দূর করবার জন্যে কান্নার প্রয়োজন মানুষ যুগযুগান্ত থেকেই উপলব্ধি করে এসেছে। ভাষাহীন শিশুর কাছে কান্নার প্রয়োজনটা তাই আরো বেশি।

শিশুর কান্নার আরেকটা বড় উপকারিতা হল, সে এর সাহায্যে বাক্‌যন্ত্রের ব্যায়াম সেরে নেয়। মানুষের ভাষার জন্যে বাক্‌যন্ত্রের যে নিপুণ কর্ম্মক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তার জন্যে জন্ম থেকেই শিশুকে চেষ্টা করতে হয় প্রায় বছর পাঁচেক। এই চেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ বলতে পারি কান্নাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিশুর কান্না থামাতে না পারলে আমরা মনে মনে অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা লাভ করতে পারি!

তবে তারস্বরে অবিরাম কেঁদে চললে শিশুর দেহ ও মনের যে ক্ষতি হয়, সেকথা আগেই বলেছি। বিশেষ করে, বাক্‌যন্ত্রের সূক্ষ্মতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে এতে খুবই। অতিরিক্ত কান্নার ফলে শিশুর কণ্ঠস্বর বিরক্তিকর তীক্ষ্ণ বা কর্কশ হয়ে উঠতে পারে, এমনকি সারাজীবন ফ্যারিঞ্জাইটিস, গলক্ষত রোগে ভুগতে হতে পারে। অনেক সময়ে ছেলেবেলায় খুব বেশি গলা ফাটিয়ে কান্নার ফলে জিবের গোড়ায় 'টনসিল' নামে যে দুটি গ্রন্থি আছে, সেগুলিও আহত হতে পারে।

শিশুর কান্নাকে খানিকক্ষণ অবহেলা করলে বা একটু সহ্য

করে থাকলে আপনিই থেমে যায়, এরকম কথা অনেক অভিজ্ঞদের মুখে শুনে থাকি। আইজ্যাক সুশান নামে এক নামকরা শিশু মনোবিদ্‌ও এমন কথা বলেছেন। কোন কোন কান্নার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা কাজে লাগতে পারে বটে, কিন্তু ভ্যালেণ্টাইন, শ্যারম্যান, বুহ্‌লার প্রভৃতি মনোবিদ্‌রা শিশুর কান্নার সুর শুনে কান্নার কারণ নির্ণয় করার যে অসুবিধার কথা বলেছেন, তা সুশানের মতের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। এ নিয়ে একটু আগে আমরাও আলোচনা করেছি ; তাই বলি আন্দাজের ওপর নির্ভর করে কোনরকম হাতুড়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই বিপজ্জনক।

শিশুর কান্নাকে উপেক্ষা করার সর্ব্বনাশা কুফল সম্পর্কে একটি শোনা ঘটনার উল্লেখ করি।····কোন গ্রামের এক বউ তার কচি কাচ্চাটিকে ঘরের এককোণে মেঝেতে শুইয়ে হাতে এক টুকরো মিষ্টি খেতে দিয়ে অন্য ঘরে আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খানিক পরে শিশুটি পরিত্রাহি কান্না সুরু করে, মা ভাবে, ওটা ওর দুষ্টুমি। সত্যিই খানিক পরে কান্না থেমে যায়। মা কাজ সেরে এসে দেখল এক অতি করুণ দৃশ্য। বাচ্চাটির হাতে যে মিষ্টি ছিল, সেটির রস তার মুখে হাতে গায়ে মাখামাখি করার ফলে তাতে আকৃষ্ট হয়ে এসেছে একদল বড় বড় লাল পিঁপড়ে ; তারা মিষ্টির লোভে শিশুর সর্ব্বাঙ্গে উঠে পড়ে মহানন্দে ভোজ লাগিয়েছে। অসহায় শিশুর জীবনরক্ষার সব আকুলতা হয়েছে ব্যর্থ ; অসহ্য যন্ত্রণায় তার প্রাণবায়ু মুক্তিলাভ করেছে !

আশার কথা এই যে, বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কান্নার পরিমাণটাও কমতে থাকে, কারণ তখন তার মুখে ভাষা ফুটতে সুরু করে। বয়স বৃদ্ধি হওয়ার আরেকটি মজা হল, শিশু নিজে পড়ে গেলে বা নিজের দোষে আহত হলে কাঁদে অল্প, বলতে গেলে একরকম কাঁদেই না। কিন্তু অপরের দ্বারা আহত বা অপমানিত হলে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে তোলে। এছাড়া, নতুন-স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন বাড়ীতে তাদের কান্নার পরিমাণটাও একটু বেড়ে গেছে। কারণ স্কুলে তার কতকগুলি প্রক্ষোভের অবদমন একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, বাড়ীতে এসে তার মুক্তি দিতে চায় সে! একটু সহানুভূতি, স্নেহ পেলে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌তে পারে।

মোটের ওপর, শিশু মনোবিদ্‌রা বারবার একথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চান আমাদের যে, শিশুরা সহানুভূতি চায়। আধুনিক ভাষায় বলতে পারি, দুনিয়ার শিশু-সমাজ তাদের এই দাবীর জন্য যুগযুগান্ত ধরে যে 'আওয়াজ' তুলে আসছে সেটাই হলো শিশুর কান্না। তাদের এই ভাষাহীন সুপ্রাচীন দাবী মানতেই হবে কর্ত্তৃত্ব-গৰ্ব্বী অভিভাবক ও শিক্ষকসম্প্রদায়কে!

আঙুল চোষা

চোদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলেকে জানতুম, বুড়ো-আঙুল চোষার স্বভাবটা কেউ তাড়াতে পারেন নি। সে যখন দাঁড়াতে শেখে নি, তখন থেকেই তার এই বদভ্যাস।

শিশুরা আঙুল চুষলে অনেকে বলে থাকেন, মাড়ি সুড়সুড় করে, তাই ছোটরা আঙুল চোষে। কিন্তু যখন দাঁত ওঠবার পরেও শিশুর এ স্বভাব থেকে যায়, তখন আর এ কৈফিয়ত খাটে না। তাই, আঙুল-চোষার আসল কারণ কি, সেটা আগে জানতে হবে।

শিশু যখন প্রথম পৃথিবীর আলো দেখে তখন তার সমস্ত স্নায়ু ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল থাকে। কিন্তু তারই মধ্যে একটু বেশি সচেতনতা থাকে মুখের মাংসপেশীগুলির।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারা শিশু চায় নিজেকে বহির্জ্জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে, আর সে ব্যাপারে তাকে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেয়ে বেশি সাহায্য করে এই মুখ। স্পর্শচেতন এই মুখের মাধ্যমেই চলে তাই শিশুর প্রথম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অভিযান।

হাতের কাছে যা-কিছু পায় সবই মুখের মধ্যে ভরে দেবার যে প্রবৃত্তি থাকে শিশুর, সেটা সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কোনও লক্ষণ নয়। সব কিছু মুখের মধ্যে পুরে শিশু অভিজ্ঞতার আস্বাদ ও আনন্দ গ্রহণ করতেই চায় মাত্র।

বুড়ো-আঙুল চোষার মধ্যে কিন্তু অভিজ্ঞতার আনন্দ গ্রহণ ছাড়া আরও কিছু থাকে। বরং বলতে পারি, আনন্দের চেয়ে একরকমের নিরানন্দই হল আঙুল-চোষার কারণ। যে-খোকা সারা সন্ধ্যেটা প্যানপেনিয়ে জ্বালাতন করেছে, ঘণ্টাখানেক বাদেই দেখা গেল, সে শুধু বুড়ো-আঙুল কেন, একেবারে গোটা-দুত্তিন আঙুল মুখে পুরে চুষতে চুষতে দিব্যি পা ছড়িয়ে ঘুমে কাদা! মা হাতের কাজ সেরে এসে একফাঁকে খোকাকে তুলে বললেন, 'আহা, বেচারীর পেট একদম পড়ে গেছে!'

তা হলে বোঝা গেল, মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ ঠিক সময়ে না পেলে শিশুর স্বভাবই হল আঙুল-চোষার সাহায্যে তার অভাব খানিকটা পূরণ করা। প্রাচীনা, আধুনিকা—সমস্ত মায়েরাই অন্তত এটুকু খুব ভালভাবেই জানেন যে,

বাচ্চাদের নিয়মিত সময়ে খাওয়াতে হয়। কোন্ শিশুকে কত ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে, সেটা শিশুর স্বাস্থ্য অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হয়। এ বিষয়ে ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করাটাই উচিত। মায়েরা এ নিয়মটি জানা সত্ত্বেও অনেক সময়ে হয়ত ব্যস্ততা বা অন্যমনস্কতার জন্যেই, খাওয়ানোর সময়টা বেরিয়ে যায়। শিশুর মানসিক প্রতিবর্তের প্রভাবে তখনই কোনকিছু বিকল্প চোষার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে এবং সবচেয়ে কাছে পায় আঙুল, তাই পুরে দেয় মুখে। এইভাবে বিকল্প তৃপ্তিলাভের প্রবৃত্তি যদি স্থায়িত্বলাভ করে, তখনই সেটা আমাদের কাছে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। মনে রাখতে হবে, এর অনেকখানি দায়িত্ব মায়েদেরই।

এই আঙুল-চোষা স্বভাবটা কিন্তু সবসময়েই যে পেটের খিদের ব্যাপারেই মাথাচাড়া দেয় এমন কথা নয়। এর প্রথম বিকাশ ঘটে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খাওয়ানোর অনিয়ম থেকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরে শিশু অন্যান্য বিষয়ে তৃপ্তিলাভের বিকল্প উপায় হিসেবেও এ পথ গ্রহণ করতে পারে এবং করে থাকে। অল্পস্বল্প পেটের গোলমাল, মায়ের সান্নিধ্যলাভে ব্যর্থতা—এসব ক্ষেত্রেও শিশু আঙুল

চোষার মধ্যে খানিকটা তৃপ্তি পেয়ে থাকে; অন্তত খানিকক্ষণ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে।

ফ্রয়েডপন্থী মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত কিন্তু অন্যরকম। তাঁরা বলেন, শিশুর যৌনচেতনার পরিণতি ঘটার প্রথম অবস্থায় আঙুল চোষাটা অবশ্যম্ভাবী। এ সময়ে শিশুর যৌনযন্ত্রগুলির পরিণতি এবং সচেতনতা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। তাই যৌনচেতনার বিকাশ ঘটে মুখে, ঠোঁটে, গালে আর আঙুলের ডগায়। শিশুর যৌনচেতনা বিকশিত হবার এই স্তরটির নাম তাঁরা দিয়েছেন অটো-ইরোটিক বা আত্মরতিজাত স্তর। তাঁদের মতে আঙুল চোষার মধ্যে দিয়ে শিশু যৌনতৃপ্তিটুকুই লাভ করে থাকে।

এঁদের মতে শিশুর আঙুল-চোষাটা খুব স্বাভাবিক এবং সেটা জোর করে বন্ধ করলে তার স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ হতে পারে; ফলে বড় হয়ে এই অসম্পূর্ণ স্তরটির বিকাশলাভের জন্যে আবার আঙুল-চোষা শুরু করতে হতে পারে। তাই, শিশুরা যদি একটু-আধটু আঙুল চোষে, তাতে বাধা না দিয়ে নিয়মিত আহার, উপযুক্ত বিশ্রাম, খোলা আলোবাতাসের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে এ স্বভাব আপনিই শুধরে যাবে।

ফ্রয়েডপন্থীই বলুন, আর যে পন্থীই বলুন, সমস্ত মনোবিজ্ঞানীরাই একটা বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আঙুল-চোষা-শিশুকে বাধা দেওয়া চলবে না কিছুতেই। আঙুল-চোষার মধ্যে সে যে তৃপ্তি পাচ্ছে, তা থেকে তাকে জোর করে বঞ্চিত করতে চাইলে আরও বেশি করে ঐ তৃপ্তি সে পাবার চেষ্টা করবে। তাই, এই স্বভাব থেকে শিশুকে মুক্ত করতে হলে তার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে অন্যদিকে। শিশুর সামনে ঝলমলে রঙিন ফানুস বা খেলনা তার নাগালের মধ্যে ঝুলিয়ে আর একটু বড়দের জন্যে রকমারি হাতের কাজ যোগাতে পারলে আঙুল-চোষার মনোবৃত্তিটা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে দেখা গেছে। রবারের চুষিকাঠি মুখে দিয়ে আঙুল-চোষার প্রবৃত্তি বন্ধ করার বিরুদ্ধে সকলে অভিমত দিয়ে থাকেন। কারণ, চুষিকাঠি, চোষার প্রবৃত্তিটাকে আরও চাঙ্গা করে তোলে মাত্র, কমাতে পারে না। বিশেষ করে, কান্নার সময়ে শিশুর মুখে টপ্ করে শুকনো চুষিকাঠিটা পুরে দেওয়ার মত প্রবঞ্চনার কথা ভাবাও অন্যায়।

বড় হলেও ছেলেদের যদি এই স্বভাব থাকে, তা হলে চিত্তাকর্ষক সৃজনমূলক কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে তার জন্য। তার হাত-দুখানিকে আরও ভাল কাজে লাগিয়ে যদি

নতুন কিছু স্বষ্টি করবার তৃপ্তি সে পেতে পারে, তবে কেন সে বৃথা আঙুল চুষতে যাবে ? আসলে, বড় হয়েও যারা আঙুল চোষে, তাদের মানসিক বেসুরো ভাবটাকে বাগে আনতে হবে সহানুভূতির সাহায্যে। অহরহ বিদ্রূপ বা ঘৃণার সাহায্যে মানসিক জটিলতার অবদমন হতে পারে, উদ্‌গমন সম্ভব নয়।

তোত্‌লামি

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা বলছি। এথেন্সের একটি পাহাড়ের চূড়োয় এক তরুণ যুবককে দেখা গেল, হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছে। পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে-পড়ে-থাকা কতকগুলি ছোট ছোট পাথরের নুড়ি

সংগ্রহ করে সেগুলি মুখের মধ্যে পুরেছে আর নুড়ি মুখে নিয়েই আকাশের দিকে মুখ করে প্রাণপণে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে! জানা গেল, ঐ যুবকটির নাম ডিমস্থেনীস এবং তাঁর তোত্‌লামি স্বভাব দূর করে ভাল বক্তা হবার

অদম্য উৎসাহের ফলেই তিনি অমন করছিলেন। সত্যি সত্যিই তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতার জন্যে আজ ডিমস্থেনীসের নাম জগতের সকলের কাছেই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। একজন বিশেষ তোত্‌লা চেষ্টা করলে যে বিশিষ্ট বক্তা হয়ে উঠতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত বোধহয় এঁর চেয়ে ভাল আর নেই।

তোত্‌লামি একরকম অস্বস্তিকর ব্যাধিই বটে। তবে এই ব্যাধির কারণ যতখানি শারীরিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক—একথা বিজ্ঞানীরা আজ বুঝেছেন। তোত্‌লামি সারানোর জন্যে নতুন করে ভাষা শেখানোর চেষ্টা এবং নানারকম তুক্‌তাক্ টোট্‌কাটুট্‌কির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এসবই বৃথা, যদি না এই অস্বস্তিকর ব্যাধির মানসিক ভিত্তির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়।

আসলে মনের প্রাক্ষোভিক পীড়ন এবং অধীরতাকেই এই অস্বস্তির মূলীভূত কারণ বলে মনে করা হয়। এই মূলীভূত কারণের দিকে আমল না দিয়ে অন্য যে কোন রকম চিকিৎসাই করা হোক্ না কেন, স্থায়ী আরোগ্যলাভ কিছুতেই সম্ভব নয়।

সাধারণত এই রোগের সৃষ্টি হয় ছেলেবেলাতেই। ছোট ছেলেমেয়েদের

প্রাক্ষোভিক পরিবেশ যদি প্রশান্ত ও সুষম না হয়, তাহলে তারা কেমন করে গড়ে তুলতে পারে তাদের স্বাভাবিক সুস্থ মন? বাবা অথবা মায়ের মানসিক সুষমতার অভাব যদি থাকে, তাহলে সুষম প্রশান্তির মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অথচ এই মানসিক সুষম প্রশান্তি হল শিশুর সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের অন্যতম প্রয়োজনীয় সহায়ক।

তোত্‌লামি আর একটি বড় কারণ হচ্ছে হীনমন্যতা। বাড়ীর লোকের কাছে শিশুর দোষত্রুটি কেবলই ধরা পড়ার ফলে তাকে যদি প্রায়ই অপদস্থ হতে হয়, তাহলে তার মনে একটা দ্বিধাগ্রস্ত হীনতার সৃষ্টি হওয়া খুব আশ্চর্য্যের নয়। এই হীনমন্যতা বড়দেরও থাকতে পারে, এবং তাঁরাও

তোত্‌লামির হাত থেকে রেহাই পান্ না। হীনমন্যতা যে দ্বিধার সৃষ্টি করে, তা থেকেই আসে তোত্‌লামি।

অনেক সময় কোন আকস্মিক প্রাক্ষোভিক আঘাতের ফলে

শিশুর মনের সুষমতা নষ্ট হয়ে গিয়ে তোত্‌লামি দেখা দিতে পারে। তবে এসব আঘাত সইতে না পারার কারণটিও লুকিয়ে আছে হীনমন্যতা সৃষ্টির মধ্যে। শিশুর মানসিক প্রশান্তির ঠিকমত অনুশীলন যদি ঘটে থাকে তার পরিবেশের সহযোগিতায়, তাহলে আকস্মিক প্রাক্ষোভিক আঘাত তোত্‌লামির জন্ম দিতে বড় একটা পারে না।

অনেকে বলেন যে, বাবা কিংবা মা যদি তোত্‌লা হন, তাহলে শিশুও তোত্‌লা হয়ে পড়তে পারে। এর কারণ যতখানি বংশগত, তার চেয়ে অনেক বেশি পারিবেশিক বলেই মনে হয়। বাগ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা পিতামাতার থেকে শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, এ ধারণা করা কতখানি ঠিক, তাতে সন্দেহ আছে। তবে শিশুর অনুকরণ-স্পৃহা যে এসব ক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

ছ'বছরের একটি মেয়ের কথা বলি। মেয়েটির গড়ন এবং গায়ের রং তার দুই ছোট ভায়ের তুলনায় খুব প্রশংসনীয় ছিল না। ফলে তার মনের একটা আফ্‌শোষ-ভাব বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ত হাবে ভাবে। এর ওপর আবার আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল—তার মা নিজেই ছিলেন

তোত্‌লা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ছেলেবেলায় ভাইবোন ও বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে, মেলামেশা করতে মেয়েটির মায়ের নিজেরও 'কেমন কেমন' লাগত। অর্থাৎ মা-ও হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। যে মেয়েটির কথা বল্‌ছি, সে শুধু যে তোত্‌লা ছিল তা নয়, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবও তার ব্যবহারে দেখা যেত। এবং মায়ের কাছে থাকতে পেলে আর কিছুই চাইত না।

চিকিৎসার প্রথম স্তরে মেয়েটিকে বন্ধুদের সঙ্গে মেশবার অবাধ ও স্বচ্ছন্দ সুযোগ দেওয়া হল এবং উৎসাহ দেওয়া হল যাতে সে নিজের ওপর বিশ্বাস আনতে পারে। তার মধ্যে যে সব গুণ আছে, যেমন নাচগান, ছবি আঁকা—সেগুলির দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হল। রাগ এবং ভয় তোত্‌লামির ভিত্তি পাকা করতে ওস্তাদ, অতএব ও দুটো থেকেও তাকে যথাসম্ভব দূরে রাখবার সবরকম চেষ্টা চলল। নানাদিকে তার মন আকর্ষণ করার ফলে মায়ের ওপর নির্ভরশীলতাও কমতে লাগল মেয়েটির। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে তার তোত্‌লামি প্রায় সেরে গেল।

আগেই বলেছি, প্রাক্ষোভিক পীড়নের ফলেই তোত্‌লামির সৃষ্টি হয়। অবশ্য শারীরিক পীড়নের ফলেও প্রাক্ষোভিক অধীরতা জাগতে পারে। তাই শিশুর ওপর যে কোনরকম পীড়নই তার তোত্‌লামির কারণ হয়ে উঠ্‌তে পারে, এটা মনে রাখা দরকার। মানুষের ভাষা প্রকাশে নিয়মিত শ্বাসক্রিয়া

একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যার ওপর শারীরিক অথবা মানসিক পীড়ন চলে, তার উদ্বিগ্ন স্নায়ুগুলি প্রায় সর্ব্বদাই এমনই টান হয়ে থাকে যে, নিশ্বাস প্রশ্বাস বিশেষ ব্যাহত হয় এবং স্বচ্ছন্দ ভাষা প্রকাশলাভ করতে পারে না।

মোটামুটি একথাই বলতে পারা যায় যে, প্রাক্ষোভিক প্রশান্তি এবং আত্মনির্ভরশীলতাই তোত্‌লামির যথার্থ প্রতিস্পর্দ্ধী। এই দুটির অভাব যার, তোত্‌লামি তাকে আক্রমণ করতে পারে অতি সহজেই। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, এই দুটি গুণেরই উৎস মূলতঃ শৈশবে।